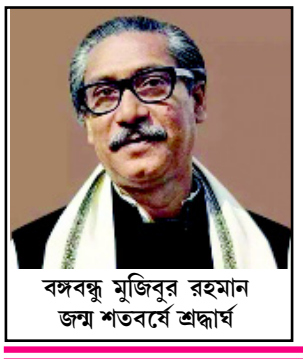

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান
জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

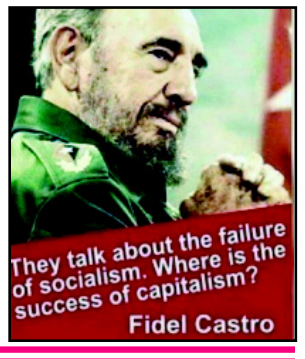

বিশেষ দশম ই-সংস্করণ, মার্চ ২০২১ ■ ৪৮তম বর্ষ

১৬ মার্চ, ২০২১ কেন্দ্রীয় অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচী

পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের সংগ্রামে শামিল হোন

রাজ্যের মানুষ এক কঠিন অবস্থার মধ্যে, দম বন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, লুঠ, চুরির রমরমা চলছে। সরকারী ক্ষেত্রে কর্মরতরাও নানাভাবে শোষণ-বঞ্চনার শিকার। এসবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বদলের জন্য মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। মানুষের এই ক্রমবর্ধমান ঐক্য কার্যত রাতের ঘুম কেড়েছে তৃণমূল-বি জে পি-র। সেই আতঙ্ক থেকেই নানা ফন্দিফিকির আঁটা হচ্ছে। কিন্তু মানুষ সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে পরিস্থিতির বদল আনবেই। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আহুত আবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা ডঃ সুজন চক্রবর্তী।

বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী

বিগত ১৬ মার্চ ২০২১ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে তিন ঘণ্টা ব্যাপী কেন্দ্রীয় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার রানী রাসমণি এভিনিউতে। বিক্ষোভ সভা পরিচালনা করে আশীষ' কুমার ভট্টাচার্য, গীতা দে ও মানস দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার প্রারম্ভে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিম। শোকপ্রস্তাব উত্থাপন ও নীরবতা পালনের পরবর্তীতে এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচীতে দাবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা এদিনের চার দফা দাবি—মহার্ঘভাতা প্রদানে বঞ্চনা, শূন্যপদ পূরণ সহ চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদান, প্রতিহিংসা পরায়ন বদলী এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ করা, গণতন্ত্র, ধর্মঘটের অধিকার সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজন সহ বহুমাত্রিক মেরুকরণের ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হন।

বিজয় শঙ্কর সিংহ, সাধারণ সম্পাদক

অবস্থান বিক্ষোভের জমায়েতের এক অংশ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলনে শামিল রয়েছেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজ। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত সমিতির কর্মী নেতৃত্বকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বদলী করা হয়েছে সংগঠনকে দুর্বল করা লক্ষ্যে। কিন্তু দীর্ঘ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহনকারী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিভিন্ন স্তরের কর্মী-নেতৃত্ব সংগঠনের দৈনন্দিন কাজকর্মকে সচল রাখাই শুধু নয়, বর্তমান রাজ্য প্রশাসনের হুমকি, রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে ধর্মঘট সহ বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচীকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে প্রতিটি জেলায় বিগত ৯ মার্চ তিন ঘণ্টা ব্যাপী বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী যে সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর নির্ভর করবে রাজ্যের আর্থ সামাজিক ভবিষ্যৎ। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, সাংসদ

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, যুগ্ম-সম্পাদক

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

৮ মার্চ, ২০২১ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আলোচনা সভা

‘বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার অন্ধকার পেরিয়ে উঠুক নতুন সূর্যের ভোর’

আলোচক
মীনাক্ষী মুখার্জি

গত ৮ মার্চ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে, সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ‘বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার অন্ধকার পেরিয়ে উঠুক নতুন সূর্যের ভোর’ শীর্ষক ঐ আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন রাজ্যের যুব আন্দোলন ও গণআন্দোলনের নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি (মীনাক্ষী মুখার্জির বক্তব্যের অংশ বিশেষ সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির আহ্বায়িকা ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুতপা হাজরা এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। ঐ সভাতেই যুব আন্দোলনের শহীদ মইদুল মিদ্যার পরিবারের জন্য ১০ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয় মীনাক্ষী মুখার্জীর হাতে। দেড় শতাধিক মহিলা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল, সংলগ্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে।

সমগ্র সভার কাজটি পরিচালনা করে গীতা দে, দেবলা মুখার্জি ও শাশ্বতী মজুমদারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

নারী দিবস
উপলক্ষে মিছিল

শহীদ মইদুল মিদ্যার পরিবারকে সাহায্য

সুতপা হাজরা

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের কাঠগড়ায় বিচার হবে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের

মার্চ, ২০০৭ থেকে মার্চ ২০২১। দীর্ঘ চোদ্দ বছর। হ্যাঁ, এই সময়টা লাগল, একটা নোংরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিদ্রোহীপনা ও বিপ্লবীয়ানার মুখোশটা খসে পড়তে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, নন্দীগ্রামের বুকের ওপর মঞ্চস্থ ঐ কুনাট্যটার প্রধান চরিত্রাভিনেতা (চরিত্রাভিনেত্রী) নিজেই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন। যে সময়ে যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতার কুর্সী বাঁচানোর জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের মনগড়া প্রতিশ্রুতি, ভিত্তিহীন প্রচার ও সহানুভূতি কুড়োনোর নানান পন্থা অবলম্বন করছেন, ঠিক সেই সময়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ (যদিও অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের দায় এড়াতে চেয়েছেন) কবুল করলেন বা করে ফেললেন কেন—এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কারও মতে, একদা স্তাবক থেকে ডিগবাজি খেয়ে (কিসের টানে কে জানে) প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওটা এক ব্যক্তিকে সপরিবারে প্যাঁচে ফেলার জন্য, এটা তাঁর কৌশল। আবার কারও মতে, চারপাশে বহমান হাওয়ার গতিপ্রকৃতি ঠাওর করতে না পেরে নার্ভাস ব্রেকডাউন হওয়ার ফলেই গোপন কথাটি আর গোপন রাখতে পারেননি। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, কেউই কিন্তু মনে করছেন না যে, তিনি বিবেকের দংশন থেকে এই ধরনের 'খ্রিস্টান কনফেশন' করে ফেলেছেন। কারণ এ রাজ্যের সদ্যজাত শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ সকলেই জানেন যে 'বিবেক' বা 'অনুশোচনা' নামক অনুভূতিগুলি তাঁর চরিত্রে কোনো কালেই ছিল না। এখনও নেই। কিন্তু আমাদের কাছে, অর্থাৎ রাজ্যবাসীর কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে ঠিক কী কারণে তিনি নিজেদেরই একটা জঘন্য অপরাধ কবুল করলেন। এমনকি রাজ্যবাসী এটাও জানতে চায় না যে, 'কালটিভেটেড' অগ্নিকন্যার এই কবুলনামার ফলে, সেই সময়ে তাঁর সাথে জুটে যাওয়া মুখে গামছা বাঁধা 'গেরিলা' যোদ্ধা, কপালে চন্দনের তিলক কাটা তাঁর ন্যাচারাল অ্যালাই' (তিনি নিজেই বলেছিলেন) রামভক্ত হনুমানের দল বা স্নো-পাউডার মাখা, চোখে রোদ চশমা লাগানো চিত্রকর, কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার চলচ্চিত্রাভিনেত্রী প্রমুখ বুদ্ধি বিক্রেতার (থুড়ি বুদ্ধিজীবী) সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া কী? কারণ স্বাধীনতা প্রপ্তির লগ্ন থেকেই বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রজন্মান্তর ঘটা এই রাজ্যের মানুষের কাছে 'মাও'-এর নাম ভাঙানো মুখে গামছা বাঁধা বিপ্লবী এবং 'রাম'-এর নাম ভাঙানো দাঙ্গাকারীদের প্রকৃত চরিত্র শুরু থেকেই অস্পষ্ট নয়। তবে একদল বুদ্ধিজীবীর সম্মিলিত 'গেল গেল রব'-এর প্রকৃত উদ্দেশ্যটা বুঝতে জীবন সংগ্রামে পোড় খাওয়া মেহনতী মানুষেরও একটু সময় লেগেছে। তথাকথিত 'পরিবর্তন'-এর পরে এক দশক জুড়ে প্রশাসকের হিংস্রতা, দুর্নীতি, ব্যভিচার ইত্যাদি সম্পর্কে যখন ঐ বুদ্ধিজীবীদলের বড় অংশই নীরব থেকেছেন বা কেউ কেউ (যাঁরা তাদের বুদ্ধির সবটা বিক্রী না করে, কিছুটা বাঁচিয়ে রেখেছেন) অত্যন্ত নিচু স্বরে (মহাভারতে যুদ্ধিষ্ঠির কথিত অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ-এর থেকেও নিচু স্বরে) মাথা নাড়তে নাড়তে এটা ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না বলেছেন, তখন সাধারণ মানুষ এঁদের প্রকৃত স্বরূপ চিনতে পেরেছেন। অ্যান্তোনিও গ্রামশি বুদ্ধিজীবীদের দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন— ক্ল্যাসিক্যাল এবং অর্গানিক। ক্ল্যাসিক্যাল বুদ্ধিজীবী তাঁরাই যাঁরা শুধুই তাঁদের সৃষ্টি নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলেন। আর অর্গানিক বুদ্ধিজীবী যাঁরা, তাঁরা তাঁদের সৃষ্টি নিয়ে খেটে খাওয়া মানুষের ভিড়ে মিশে যান প্রয়োগের জন্য। আজ গ্রামশি যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে পশ্চিমবাংলার পরিবর্তনপন্থী বুদ্ধিজীবীদের রকমসকম দেখে হয়তো বা অর্গানিক ও ক্লাসিক্যালের বাইরে একটা তৃতীয় গোষ্ঠীর কথা বলতেন। তিনি কী নাম দিতেন তা আমরা বলতে পারবো না। কিন্তু চরিত্র অনুযায়ী নাম হতে পারত 'ওয়েদার কক ইনটেলেকচ্যুয়াল' বা 'হাওয়া মোরগ বুদ্ধিজীবী'। ফলে আগামী দিনে এরা আবার কোন্‌দিকে ঘুরবেন, তা নিয়ে আলোচনা পাড়ার চায়ের দোকানে সান্ধ্য আড্ডার বিষয় হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে শোষিত-অত্যাচারিত শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, শিক্ষক, কর্মহীন যুবক-যুবতী ও সম্মান হানির আশঙ্কায় দিন কাটানো মহিলাদের কপালে এতটুকু চিন্তার ভাঁজ পড়েনি।

চোদ্দ বছর পর যে কুনাট্যটির যবনিকা পতন হল, যার স্ক্রিপ্ট্‌টাই রচনা করা হয়েছিল একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে, তা গত দশ বছরে মুখে গামছা বাঁধা গেরিলা যোদ্ধাদের অনেককেই রাজ্যের শাসকদলে পুনর্বাসনের সুযোগ দিয়েছে। অনেকেই জঙ্গল ছেড়ে বিয়ে থা করে সংসারী হয়েছে। কেউ কেউ 'বিপ্লবী' থাকাকালীন রাতের অন্ধকারে লোটার যে অভ্যাস ছিল, তা ত্যাগ করে, পঞ্চায়েতের চেয়ার দখল করে দিনের আলোয় লুট করার অভ্যাস রপ্ত করেছে। রামভক্ত কপালে তিলক কাটা হনুমান গোষ্ঠীর বহুদিনের স্বপ্ন ছিল নবজাগরণের পীঠস্থান এবং তারই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠা বামপন্থী আন্দোলনের শক্তিশালী কেন্দ্র এই বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে হিন্দুত্বের বড়ি খাইয়ে ঘেঁটে দেওয়ার। এই লক্ষ্যে তারাও সফল। শুধু সফল নয়, এখন এতটাই সফল যে যাদের হাত ধরে গুটি গুটি পায়ে, এ রাজ্যে তারা ঢুকলো, এখন তাদেরই গিলে খেতে শুরু করেছে। বুদ্ধিজীবীরাও চোদ্দ বছর আগে পায়ে ধুলো লাগানোর পুরস্কার পেয়েছেন। পৌণঃপুণিক 'শ্রী' ভূষণ, বিভিন্ন সরকারী কমিটির লুক্রেটিভ পদে চেপে বসার সুযোগ পেয়ে, তাঁদের বুদ্ধির বিকাশ না ঘটলেও (একজন শশ্রু-গুম্ফ মণ্ডিত চিত্রকর তো দুরন্ত এক্সপ্রেসের গায়ে তুলি বোলানোর পর আর কোনো ছবি এঁকেছেন বলে শোনা যায়নি) শারীরিক ও আর্থিক স্বাস্থ্যের বিকাশ নিশ্চিতভাবেই ঘটেছে। এককথায় কুনাট্যের কুশীলবরা সকলেই নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে, অথচ সর্বনাশ হয়ে গেল গোটা রাজ্যের, রাজ্যের সাধারণ মানুষের। রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা লোলুপ কিছু কুচক্রীর হাতে বলি হল সাধারণ মানুষের স্বার্থ। এর কৈফিয়ৎ কিন্তু মানুষ চাইছে।

১৯৭৭ সাল থেকে নতুন সূর্যের আলোয় পথ চলতে শুরু করেছিল পশ্চিমবাংলা। গঠিত হয়েছিল প্রথম বামফ্রন্ট সরকার। এই সরকার গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল 'লাঙ্গল যার, জমি তার' দাবিকে সামনে রেখে গড়ে ওঠা উত্তাল কৃষক আন্দোলন। তাই প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের ৩৬ দফা কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় ছিল কৃষকের হাতে জমির অধিকার তুলে দেওয়া। তাই কেন্দ্রীয় ভূমি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে রূপায়িত হয়েছিল ভূমি সংস্কার কর্মসূচী। মোট ১১,২৭৭ লক্ষ একর জমির মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছিল গরিব ও প্রান্তিক কৃষকদের হাতে। বর্গা রেকর্ডে নথিভুক্ত হয়েছিলেন ১৫.৩৩ লক্ষ বর্গাদার। পাশাপাশি বিকাশ ঘটেছিল কৃষির সাথে সংযুক্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের। গ্রামীণ অর্থনীতির এই বিকাশের সুফল গ্রামবাংলার সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য গড়ে উঠেছিল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত। গ্রামীণ জোতদার-জমিদারদের বাস্তুঘুঘুর বাসা ভেঙে গড়ে ওঠা এই বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামো ছিল প্রকৃত প্রস্তাবেই আব্রাহাম লিঙ্কন কথিত গণতন্ত্রের অব্যর্থ সংজ্ঞা—'For the people, of the people, by the people'। ভূমি সংস্কার, খাদ্যশস্য সহ বিভিন্ন ধরনের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সম্মিলিত প্রভাবে ২৭ হাজার কোটি টাকার শিল্পসামগ্রী কেনার চাহিদা অর্থাৎ বাজার সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে, জামা-কাপড়-জুতো থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন কম্পিউটারের মতো ভোগ্যপণ্যের বাজারও সম্প্রসারিত হয়েছিল। পাশাপাশি শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের নিরিখে পশ্চিমবাংলার অগ্রগতি ছিল নজরকাড়া। আর এই সমস্ত সাফল্যকে মজবুত বনিয়াদের ওপর দাঁড় করিয়েছিল ভাষা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতির আদর্শ পরিবেশ। মরিচঝাঁপি বা বিজন সেতু কাণ্ড এবং ১৯৮৪-র শিখবিরোধী দাঙ্গা ও ১৯৯২-এর বাবরি মসজিদ ধ্বংস উত্তর বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গাও কিন্তু এ রাজ্যের সামাজিক স্থিতিকে এতটুকু বিঘ্নিত করতে পারেনি।

এই বহুবিধ সাফল্যের প্রেক্ষাপটেই মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প স্থাপনের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই গৃহীত মাসুল সমীকরণ নীতি ও লাইসেন্স প্রথা, পরাধীন ভারতে শিল্পে অগ্রনী রাজ্য পশ্চিমবাংলাকে বি-শিল্পায়নের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল। এই অন্ধকার থেকে রাজ্যকে বের করে এনে শিল্পায়নের আলোকিত পথে প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ শুরু হয় বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প ও হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। পরবর্তী পর্বে দেশজুড়ে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি লাগু করার বাধ্যবাধকতায় প্রত্যাহৃত হয় লাইসেন্স প্রথা এবং মাশুল সমীকরণ নীতি। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে গৃহীত হয় নয়া শিল্পনীতি। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্প গড়ে তোলার পাশাপাশি বেসরকারী ও যৌথ উদ্যোগে শিল্পায়নের পরিকল্পনা। 'কৃষি ভিত্তি, শিল্প ভবিষ্যৎ' ঘোষণার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক কাজের সুনির্দিষ্ট অভিমুখ স্থিরীকৃত হয়। এর সুফলও ফলতে শুরু করে। ২০০১ থেকে ধারাবাহিকভাবে শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০০৭ সালে (কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের বছর) মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০৭২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।

হুগলী জেলার সিঙ্গুরে নির্মীয়মান গাড়ির কারখানা, নন্দীগ্রামে (চক্রান্তের মূল প্লট) প্রস্তাবিত কেমিক্যাল হাব এবং ২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমস্ত ধরনের জনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির রামধনু (আকাশের রামধনুর মতো নয়নাভিরাম নয়) জোট ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। এতদসত্ত্বেও ২০১০ সালে রাজ্যের শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫ হাজার ৫২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। একেকটি মূল শিল্প এবং তাকে কেন্দ্র করে একাধিক অনুসারী শিল্পে কর্মক্ষম যুবক-যুবতীদের সামনে কর্মসংস্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এক কথায় সমগ্র দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া নয়া উদারবাদী নীতির কাঁটাতার ও বিশ্ব আর্থিক মন্দার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের বুকে খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ এক বামপন্থী বিকল্প যখন ধীরে ধীরে পাখা মেলছে, সেই পাখার নিচে উন্নয়ন ও শান্তির পরিবেশ যখন দেশের অন্য প্রান্তের মানুষের কাছে এক বিকল্প সম্ভাবনার ছবি আঁকছে, ঠিক তখনই সমাজ ও সভ্যতার শত্রুদের মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। ঐ বিকল্প সম্ভাবনাকে হত্যা করে দেশী-বিদেশী প্রভুদের তুষ্ট করার নৈবেদ্য সাজানো হয়েছিল।

আসলে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির প্রবক্তারা চায়, তাদের প্রেসক্রিপসনকেই আবিশ্ব কঠোরভাবে অনুসরণ করা হোক। কোন ধরনের বিকল্প ভাবনা মাথা তুলুক, তারা চায় না। তা সে ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া বা পশ্চিমবঙ্গ যেখানেই হোক না কেন। তাই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, বিকল্প ভাবনাকে একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলার জন্য। এই লক্ষ্যে হায়ার করা হয় সেইসব ধ্বংসাত্মক শক্তিকে যাদের অন্তত তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে—(১) ক্ষমতালোলুপ, (২) মিথ্যা ও কুৎসা রটনায় সিদ্ধহস্ত এবং (৩) লুম্পেন সংস্কৃতির বাহক। এদেরকে সামনে রেখে, অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে তাদের পিছনে জড়ো করে শুরু হয় ধ্বংস যজ্ঞ। অপারেশন নন্দীগ্রামও ছিল তাই। নীতিহীনতার তরজা যা প্রকাশ্যে নিয়ে এলো।

অসংখ্য মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এই ষড়যন্ত্রীদের ইতিহাস ক্ষমা করবে না। সময়ের গিলোটিনে ক্ষমতার মদমত্ততা কাটা পড়বেই। □

২ এপ্রিল, ২০২১

আত্মনির্ভরতা ঃ দেশের সম্পদের ঢালাও বেসরকারীকরণ?

১৯৯১-২০১৪)২৩ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ হয়েছিল ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৯০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। আর শুধু মোদি শাসনে ৭ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৬৬ কোটি টাকা। আগের ২৩ বছরের তুলনায় মোদি শাসনে বিলগ্নীকরণ বৃদ্ধি প্রায় ১৬০ শতাংশ। আর পূর্বতন ইউপিএ-২ সরকারের তুলনায় ২৬.৭ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে মোদি সরকার বিলগ্নিকরণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে রয়েছে জীবন বিমা করপোরেশন, দুটি ব্যাঙ্ক, আইডিবিআই, বিপিসিএল, এয়ারইন্ডিয়া, শিপিং করপোরেশন, কনটেনার করপোরেশন, ভারত আর্থ মুভার্স, পঞ্চ হংস, নীলাচল ইস্পাত নিগম প্রভৃতি।

১৯৯১ সালে নরসিমা রাও-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠার পরই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বিরাষ্ট্রীয়করণ-বিলগ্নিকরণ রাষ্ট্রীয় অ্যাজেন্ডায় পরিণত হয়। ১৯৯১-পরবর্তী ২৮ বছরে কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার ছিল ১৫ বছর, বি জে পি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ছিল ১১ বছর এবং অন্যান্য সরকার দু'বছরের মতো। এই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে; কিন্তু কোনো কেন্দ্রীয় সরকারই এই নীতি পরিত্যাগ করেনি। বামপন্থী দলগুলি ১৯৯১ সালে এই নীতি অনুসৃত হওয়ার সময় থেকেই সংসদের ভিতরে-বাইরে এর সক্রিয় বিরোধিতা করেছে। দেশজুড়ে এই নীতির বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করেছে, আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলেছে এবং ২০ টা সর্বভারতীয় ধর্মঘট সংগঠিত করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণে বামপন্থী দলগুলির এই নীতিগত বিরোধিতার কারণে প্রথম ইউপিএ সরকারের (২০০৪-০৯) সময়কালে বিলগ্নিকরণের পরিমাণ অনেক কম ছিল; মাত্র ৮ হাজার ৫১৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। কারণ, ওই সরকার একটা বড়ো সময় ধরে বামদলগুলির সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই প্রথম ইউপিএ সরকার বড়ো ধরনের কোনো বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। বলা যায়, দেশের সম্পদকে জলের দরে বেচার হাত থেকে তখন বামপন্থীরা প্রকৃত দেশপ্রেমিকের ভূমিকা পালন করেছিল।

সারণি-১ এ দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৯-২০০৪ সময়কাল, যখন কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় ছিল, তখনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বিলগ্নিকরণের পরিমাণ বিশাল হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৫ বছরে এই বৃদ্ধির হার ছিল তার আগের ৭ বছরের (১৯৯১-১৯৯৯) তুলনায় ৭০ শতাংশ বেশি। আর এই পরিমাণই প্রথম ইউপিএ সরকারের সময়ে হ্রাস পায় ৭০ শতাংশ। যদিও পুরো ৫ বছর ওই সরকারকে সমর্থন করেনি বামপন্থীরা। ৪ বছরের মতো সময় ওই সরকার বামপন্থীদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল।

এর থেকেই বোঝা যায় রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ রক্ষার দেশপ্রেমিক দায়িত্ব একমাত্র বামপন্থীরাই পালন করতে পারেন। তাদের হাতেই এই সম্পদ সবচেয়ে সুরক্ষিত থাকে। বি জে পি'র হাতে নয়।

দুটি সারণিতে ১৯৯১ থেকে ২০২১-এর ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বিলগ্নিকরণের হিসাব বিবৃত করা হলো। □

সারণি-১
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বিলগ্নিকরণ (১৯৯১-২০০৪)

সাল	বিলগ্নিকরণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১৯৯১-৯৬	৯,৯৬১.৮৩
১৯৯৬-৯৯	৬,৬৬০.৭৮
১৯৯৯-২০০৪	২৮,২৮৪.৪৮
২০০৪-০৯	৮,৫১৫.৯৪
২০০৯-১৪	৯৯,৩৬৭.৪৬
মোট	**১,৫২,৭৯০.৪৯**

সারণি-২
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বিলগ্নিকরণ (২০১৪-ফেব্রুয়ারি, ২০২১)

সাল	বিলগ্নিকরণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১৪-১৫	২৬,০৬৮.২৫
২০১৫-১৬	২৩,৯৯৬.৮০
২০১৬-১৭	৪৬,২৪৬.৫৮
২০১৭-১৮	১,০০,০৫৬.৯১
২০১৮-১৯	৮৫,০০০
২০১৯-২০	৫০,২৯৮
২০২০-২১	৬৫,০০০
মোট	**৩,৯৬,৬৬৬.৫৪**

সারা ভারত কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকর চেক দেওয়া হল রাজ্যের কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বের হাতে

নকল নয় আসল যুদ্ধের সঙ্গী হবো আমরা

মানস কুমার বড়ুয়া

এমন আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছি আমরা যেখানে যখন তখন অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে পারে। অর্থাৎ জেগে উঠতে পারে যে কোনো সময় এমন একটি আগ্নেয়গিরির চূড়ায় অবস্থান করছি আমরা। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতিকে ফ্যাসিবাদী শক্তি আর এস এস অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দল বিজেপির কার্যকলাপ এইরকম পরিস্থিতিই সৃষ্টি করেছে। বিজেপি কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসীন হয়েছে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বারের জন্য। এইসময় পর্বে বাজার মৌলবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ হাত ধরাধরি করে চলছে, উভয়ে উভয়ের স্বার্থরক্ষার জামিনদার। আদানী-আম্বানী এবং আর এস এস-বি জে পি-মোদি সব শ্রেণীস্বার্থে একাকার হয়ে গেছে। কর্পোরেট পুঁজির সাথে শাসকশ্রেণীর মাখামাখি এটা আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে। কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপট আরও ভয়ঙ্কর—কারণ দেশ শাসন করছে একটি ফ্যাসিবাদী সংগঠন পরিচালিত রাজনৈতিক দল। তারা যত শক্তি অর্জন করছে তত তাদের ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসোলিনী-হিটলারের হাত ধরে যে ফ্যাসিবাদ-নাজিবাদ পৃথিবীতে এসেছিল তার মৌলিক কার্যকলাপের সাথে পৃথিবীর দেশে দেশে বর্তমানে নব্য ফ্যাসিবাদী দলগুলির কার্যধারায় মিল রয়েছে। তবে ধরনটা অবশ্যই আলাদা। মিল রয়েছে আর এস এস-বি জে পির সাথেও। ফ্যাসিবাদী শক্তির উর্বর জমি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্কট। বর্তমানে বিশ্ব পুঁজিবাদ ভয়াবহ সঙ্কটে নিমজ্জমান। এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার হওয়ার কোনো দিশা কেউ বাতলাতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করছে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তি। দ্বিতীয়ত ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা দখলের সর্বোচ্চ হাতিয়ার হলো উগ্র জাতীয়তাবাদ। ফ্যাসিবাদী উগ্র জাতীয়তাবাদ মানে একটি জাতিই শ্রেষ্ঠ এবং তার বাইরে বাকিরা শত্রু। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী স্লোগানের আড়ালে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে ফ্যাসিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর নৃশংসতম বহিঃপ্রকাশ আমরা ইতিহাসে দেখেছি গত শতাব্দীর তিরিশ ও চল্লিশের দশকে।

ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠা ১৯২৫ সালে। দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে এদের কোনো যোগাযোগ ছিল এরকম প্রমাণ কোনো কট্টর সংঘীও দিতে পারবে না। উল্টে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালি করার উদাহরণ অতীতে আছে এদের। এর উদাহরণ হিসাবে আর এস এস-র তথাকথিত 'বীর' ডি ভি সাভারকরের নাম বলা যেতে পারে। সাভারকরকে ১৯১১ সালে আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে বন্দী অবস্থায় পাঠানো হয়। তাঁর কারা জীবন শুরু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই দ্রুত জেল থেকে মুক্তির জন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের নিকট তিনি প্রথম আবেদন করেন। ১৯২৩ সালে পুনরায় এবং ১৯২৪ সালে তাঁর চূড়ান্ত মুক্তির পূর্বে পর্যন্ত তিনি বারংবার ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন করেছিলেন। সেলুলার জেল থেকে ১৯২৩ সালে ডি ভি সাভারকার যে পত্রটি লেখেন, তা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লেখেন, ''ব্রিটিশ সরকার যদি আমাকে অনুগ্রহ করে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দেয়, তাদের বহুবিধ লাভবানদের মতো একবারের জন্য নয়, আমি হবো ব্রিটিশ শাসনকার্যের কট্টর প্রবক্তা এবং ইংরেজ সরকারের বিশ্বস্ত, যা হবে এই চলমান প্রক্রিয়ার প্রধানতম শর্ত।... আমি প্রস্তুত ব্রিটিশ সরকারের সেবা করতে। যে কোনো অবস্থায় সরকার যেভাবে চাইবে, তার জন্য আমিও কথাবার্তা, কর্তব্যবোধে চালিত হবো। (সূত্র ঃ আর সি মজুমদার, আন্দামান বন্দী শিবির, প্রকাশন, ১৯৭৫)

সাভারকার যিনি আর এস এস-র বীর হিসাবে পরিচিত, তিনি ঔপনিবেশিক শাসকদের নিকট বার বার মুচলেকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো পর্বেই আর এস এস-কে যুক্ত হতে দেখা যায়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৪০-৪১-র সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার, বোম্বাই-এর নৌ-বিদ্রোহকে ঘিরে ১৯৪৫-৪৬-এর আন্দোলন ইত্যাদি ১৯৪০-এর দশকের ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে আর এস এস দূরে থেকেছে। অথচ ১৯৪০-র দশকের প্রথমদিকে ও মাঝামাঝি সংগঠনের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল।

আর এস এস জন্মলগ্ন থেকেই আদর্শগতভাবে অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিস্ট চরিত্রের অধিকারী। সংঘের সাথে ইতালির ফ্যাসিস্টদের যোগসূত্রের কথা বলতে গিয়ে মারিয়া কাসোলরি বলেছেন, ''হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সাথে ফ্যাসিস্ত জামানার প্রতিনিধিবর্গ, এমনকি স্বয়ং মুলোলিনীর প্রত্যক্ষ সংযোগ নিয়ে এর পূর্বে কোনো আলোচনা হয়নি। এখন এটা পরিষ্কার যে, ফ্যাসিবাদের ভাবাদর্শ ও ব্যবহারিক দিকগুলি সম্পর্কে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের আগ্রহ নিছক নির্বস্তুক ছিল না। ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের ফ্যাসিবাদ ও মুসোলিনী সম্পর্কে অনুরাগকে শুধুমাত্র সাময়িক কৌতুহল বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল... এ ধারণাও ঠিক নয়। বরং তা ছিল, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের, ইতালির স্বৈরতন্ত্র ও তার সর্বেসর্বা সম্পর্কে গভীর মনোযোগের চূড়ান্ত ফলশ্রুতি। এই হিন্দুত্ববাদীদের কাছে ফ্যাসিবাদ ছিল রক্ষণশীল বিপ্লবের নমুনা। এই ধারণা মারাঠি পত্রপত্রিকায় আলোচিত হয়েছে মুসোলিনীর আমলের গোড়া থেকেই। (সূত্র ঃ হিন্দুত্ববাদ-ফ্যাসিবাদ যোগসাজস ১৯৩০-র দশক, মারিয়া কাসোলারি)

মুসোলিনীর মতো হিটলারও ছিলেন আর এস এসের কাছে আর এক মহানায়ক। বিশেষজ্ঞদের মতে আর এস এস-এর মুসলিম বিদ্বেষের অনেকটাই হিটলারের কাছ থেকে ধার করা। এম এস গোলওয়ালকার-এর মতে, ''জার্মানির জাতিগত গর্ব আজ একটা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। জাতি এবং তার সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য সেমিটিক জাতিগুলিকে অর্থাৎ ইহুদিদের সাফ করে দিয়ে সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছে জার্মানরা। জাতিগর্বের চরম প্রকাশ দেখা গেছে সেখানে। জার্মানি আরও দেখিয়ে দিয়েছে মূলগত পার্থক্য বিশিষ্ট বিভিন্ন জাতি

ও সংস্কৃতির পক্ষে একটি দ্রবীভূত সমগ্র হিসেবে একাত্মীভূত হওয়া কতখানি অসম্ভব। এ এমন এক শিক্ষা যা আমাদের হিন্দুস্তানের পক্ষে শেখা ও তা কাজে লাগিয়ে লাভবান হওয়া উচিৎ।'' (সূত্র ঃ উই অর আওয়ার নেশানহুড ডিফাইন্ড, এম এস গোলওয়ালকার)

এহেন এক সংগঠনকে দেশপ্রেমিক বলে দরাজ শংসাপত্র দিয়েছেন আমাদের রাজ্যের আজকের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। সে সময় বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সরাসরি আর এস এস-র সহযোগিতাও চেয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী। আহ্লাদে যোলখানা হয়ে তাঁকে 'মা দুর্গা' আখ্যা দিয়েছিল তারা। সেই দেওয়া-নেওয়ার খেলা এখনও চলছে বলেই সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটি চ্যানেলে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন আর এস এস-র সাথে তার কোনো লড়াই নেই। আর মাননীয়ার ভাষায় ওরা নাকি ভোটে দাঁড়ায় না। বিজেপি-আর এস এস-র সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল একজন যখন একথা বলেন, তখন বিজেপি-র সাথে এখন যে লড়াইটা দেখানো হচ্ছে সেটা সন্দেহজনক মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

তৃণমূল-বিজেপির সখ্যতা ১৯৯৮ সালে দলটি সৃষ্টি হবার সময় থেকেই সবাই দেখেছে। নবগঠিত তৃণমূল বিজেপির সাথে জোট করে বিজেপি-আর এস এস-কে হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসে। তৃণমূল নেত্রী বলেছিলেন যে তৃণমূলের স্বাভাবিক মিত্র হলো বিজেপি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-জঙ্গলমহল পর্বের ষড়যন্ত্রে হিন্দুত্ববাদী অপশক্তি গোপনেই শুধু নয়, প্রকাশ্যেও ভূমিকা নেয়। কিছুদিন আগে নন্দীগ্রামে নির্বাচনী প্রচারে নন্দীগ্রাম ষড়যন্ত্রের কথা মাননীয়া নিজেই স্বীকার করেছেন। এই চক্রান্তে কাজে লাগানো হয় সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক শক্তিকেও। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়ন নীতির বিরোধিতায় তৃণমূল নেত্রীর 'অনশন' মঞ্চে ২৫ ডিসেম্বর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান বিজেপির তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং। ১০ জানুয়ারি ২০০৭ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ নন্দীগ্রাম সফর করেন। ২০০৭ সালের ১৩ নভেম্বর বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে বিজেপি-তৃণমূল-শিবসেনা প্রভৃতি দলের একাধিক নেতা নন্দীগ্রামে যান বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা করতে। সেই সময় বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করতে সবরকম রসদ নিয়েই তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়েছিল আর এস এস-বিজেপি।

২০১১ সালের ১৩ মে বিধানসভার ফলাফল ঘোষণার মধ্য দিয়ে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। উচ্ছ্বসিত হয় বিজেপি, সেই উচ্ছ্বাস ওরা লুকিয়ে রাখেনি। তার পরদিন, ১৪ মে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত হয় গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরামর্শপূর্ণ নিবন্ধ। শিরোনাম—''প্রথম রাতেই বিড়াল মেরে দিন''। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধেই লিখেছেন জানিয়ে মোদির উচ্ছ্বসিত পরামর্শ মমতা ব্যানার্জীকে—''আদরনীয় মমতা বোন, প্রথমেই আপনাকে আমার অভিনন্দন। আপনার কাছে আমার গগনচুম্বী প্রত্যাশা। কিন্তু প্রথমেই বলি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথাটা বললাম। ... আপনি একজন দৃঢ়চেতা মুখ্যমন্ত্রী, আপনার বুদ্ধিমত্তার ওপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কিন্তু প্রশাসনে কঠোরতা খুব আবশ্যক। এই কঠোরতা শুরুতেই আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি।'' দাদার পরামর্শ পালনের ঠেলা বুঝতে পেরেছিল শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নয়, প্রশাসনের অভ্যন্তরে সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উপর নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর আক্রমণ। যা আজও অব্যাহত আছে।

২০১১ সালের ২৩ মে সংঘ পরিবারের বাংলা মুখপত্র 'স্বস্তিকা'-য় প্রকাশিত সংখ্যায় 'দুঃশাসনের অবসান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়---'অবশেষে দুঃশাসনের অবসান। গত ৩৪ বৎসর ধরিয়া সারা বাংলার বুকের উপর ফ্যাসিবাদী দলতন্ত্রের যে জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিয়াছিল, রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই পাথরকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। আলিমুদ্দিনওয়ালাদের যে ধরাশায়ী করা সম্ভব ইহা লইয়া অনেকেরই সন্দেহ ছিল।... যদিও কমিউনিস্টরা বিজেপিকেই শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পয়লা নম্বরের শত্রু বলিয়াই মনে করে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী সরকার ও ক্যাডারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারই নেতৃত্বে তৃণমূল জোটের এই বিরাট জয়।''

এই বোঝাপড়ার রেশ ধরেই ২০১৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড ময়দানে বিজেপির প্রচার সভায় নরেন্দ্র মোদি 'দুহাতেই লাড্ডু'-র মতবাদ প্রচার করেছিলেন। মোদি বলেছিলেন 'বিকাশের মন্ত্র নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আমাদের সুযোগ দিলে পশ্চিমবঙ্গের দু-তিন গুন ফায়দা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের জন্য উন্নতি করবেন। কেন্দ্র থেকে আমি এই রাজ্যের উন্নতি করবো। আমাদের মাথার উপর প্রণবদা (তৎকালীন রাষ্ট্রপতি) আছেন, উনিও করবেন।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে মোদি বলেন, ''বাংলায় পরিবর্তনের সরকার এনেছেন আপনারা.... দিল্লীতে মোদির সরকার আনুন। তারাও উন্নয়নের কাজ করবে।... আপনাদের দু'হাতেই লাড্ডু থাকবে।''

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের পরও সংঘ মুখপত্রের প্রচ্ছদ নিবন্ধের শিরোনাম ছিল—''কমিউনিজমের শোকযাত্রায় শাপমুক্তি বাংলার''। এই শিরোনামে সংঘ স্বীকার করে নেয় কমিউনিজম বা সাম্যবাদী ভাবাদর্শই কমুউনিস্টদের মূল লক্ষ্য। এই নিবন্ধে তৃণমূল-বিজেপির গোপন বোঝাপড়া খোলাখুলি স্বীকার করা হয়েছে। লেখা হয়েছে, ''... তৃণমূলের এই জয় সম্ভব হয়েছে স্রেফ জাতীয়তাবাদী জোটের ফলে। জাতীয়তাবাদী ভোটাররা অনেকক্ষেত্রেই দেখেছেন যেসব জায়গায় বিজেপি দুর্বল, জেতার সম্ভাবনা ক্ষীন, সেখানে ঢেলে তারা তৃণমূলের পক্ষে গিয়েছেন। ঠিক যেমনটি হয়েছিল গত পৌরসভা নির্বাচনে।''

এই বোঝাপড়ার বিষময় ফল এখন ফলতে শুরু করেছে। কোনোদিন যা হয়নি পশ্চিমবঙ্গে অতীতে, সেই দাঙ্গার পরিস্থিতি কোথাও কোথাও সৃষ্টি হচ্ছে। তৃণমূলের দশ বছরের শাসনে আর এস এস তার জাল অনেকটাই বিস্তার করে ফেলেছে। বিজেপির সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবিলা করতে তৃণমূলের পাল্টা সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি একদিকে যেমন রয়েছে, অপরদিকে বিজেপি-আর এস এস নয় তৃণমূলই বড় হিন্দুপ্রেমী এই প্রচারের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে ভয়ঙ্কর অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে।

সারদা চিটফান্ড, নারদ ঘুষ কেলেঙ্কারি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই তৃণমূল বিজেপির বোঝাপড়ার রাজনীতি প্রত্যক্ষ করেছে রাজ্যবাসী। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, এই রাজ্যে একটি বাড়ি আর এস এস-র, তার দুটি ঘর ভাড়া দিয়েছে তৃণমূল আর বিজেপিকে। এঘর ওঘর যাতায়াত এমনভাবে হচ্ছে যে কে কখন কোন্ দলে এটা বোঝা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। মানুষ যখন দেখছে তৃণমূলের যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, তাদের সবাইকে বিজেপি নিয়ে নিচ্ছে, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে তো নয়ই, দুর্নীতির প্রশ্নেও কারও অবস্থানই দৃঢ় নয়। এমতাবস্থায় মিডিয়াতে দ্বিদলীয় রাজনীতির নামে নানা ধরনের নাটক স্পনসরড করা হচ্ছে। লকডাউনের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা মানুষের পাশে থাকল তাদের ব্রাত্য করবার ষড়যন্ত্রের বড় অংশীদার মিডিয়াও বটে।

ত্রিপুরাতেও হঠাৎ করে গজিয়ে উঠেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ত্রিপুরাবাসী দেখেছেন তৃণমূলের সাইন বোর্ডটা পাল্টে এখন বিজেপির সাইন বোর্ড বসেছে। সম্প্রতি একজন বামপন্থী নেতৃত্ব একটি সাক্ষাতকারে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ফলাফল ত্রিশঙ্কু যদি হয় তাহলে তৃণমূল-বিজেপি এক হয়ে সরকার গড়তে পারে। খুব ভুল কী বলেছেন তিনি? ২০১৭ সালে মনিপুরে বিধানসভা নির্বাচনের পর সেখানে বিজেপিকে সরকার গড়তে সমর্থন করে একমাত্র তৃণমূল বিধায়ক। আস্থা ভোটে বিজেপিকে সমর্থন করার পর ওই তৃণমূল বিধায়ক বলেন, ''দলের নির্দেশেই সমর্থন।'' সেই বিধায়ককে কি তৃণমূল কংগ্রেস বহিষ্কার করেছিল? না করেনি।

পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, তামিলনাড়ু, আসাম ও পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় (এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক) এই নির্বাচন হচ্ছে। ২৭ মার্চ '২১ প্রথম দফার ভোট। ২ মে '২১ ফলাফল ঘোষণা। দ্বিদলীয় রাজনীতির প্রচারে মিডিয়ার আকাশ বাতাস মুখরিত করার চেষ্টা এখন অনেকটাই চুপসে গেছে। তৃতীয় শক্তি হিসাবে উঠে এসেছে বামপন্থীদের নেতৃত্বে গঠিত সংযুক্ত মোর্চা। সেখানে বামেদের সঙ্গে রয়েছে জাতীয় কংগ্রেস ও আই এস এফ (ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট)। এই সময়কালে দুটি দলের নীতিহীন ঝগড়াঝাটি, দলবদলের নাটক ইত্যাদি দেখে মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছেন সোনার বাংলা গরুর দুধ থেকে তৈরি সোনা দিয়েও হবে না, আবার দুর্নীতিগ্রস্ত দলের পরিকল্পনাহীন রাজনীতিতেও হবে না। সোনার বাংলা বা আরও উন্নত বাংলা গড়তে প্রয়োজন বিকল্প দিশা। সেই দিশার কথা বলছে একমাত্র সংযুক্ত মোর্চা। মানুষ এটাও প্রত্যক্ষ করেছে যে লকডাউনের ভয়াবহ সঙ্কটের সময় শুধু নয়, সঙ্কট কিছুটা কেটে যাওয়ার পর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতির বিরুদ্ধে কারা পথে নেমেছে এবং আক্রান্ত, রক্তাক্ত হয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছে বলেই বাণিজ্যিক মিডিয়াও এখন বামেদের সংগ্রাম আন্দোলন, সংযুক্ত মোর্চার স্মরণকালের মধ্যে সেরা ব্রিগেড সমাবেশকে উপেক্ষা করার সাহস পাচ্ছে না। তার মধ্যেও উল্টোদিকে স্রোত ঘোরাবার প্রচেষ্টা আছে। তাই তো ২৮ ফেব্রুয়ারি '২১ ব্রিগেডে অত বড় মানুষের জমায়েতে একাধিক বক্তার বক্তব্যকে ছাপিয়ে মিডিয়া ও বিরোধী দলের আলোচনায় আসে আই এস এফ-র নেতা আব্বাস সিদ্দিকির প্রসঙ্গ। তাদের বক্তব্য,

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে

পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাড়া মুক্তি নেই

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

ভারতবর্ষের মানুষ আজ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। কেন্দ্রের সরকার পরিচালনায় চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। সরকার গঠনের পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর যে আক্রমণ শুরু হয়েছে তা কোনো সাময়িক আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত নয়। এগুলি সুনির্দিষ্ট আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্জাত সুদুরপ্রসারী লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত। এই আদর্শগত লক্ষ্যই হলো, ভারতীয় জনতা পার্টির পরিচালক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এ্যাজেন্ডা। অতীতে একচ্ছত্র রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং একচেটিয়া জাতীয় পুঁজির স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানা হয়েছে। কিন্তু সেই সময় লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র গণতন্ত্রই। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র আক্রমণের লক্ষ্য ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর সেই সময় কোনো আঁচড় লাগেনি। কিন্তু আজকের গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ ভিন্ন ধরনের। গণতন্ত্রকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে মূল লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে আঘাত করা। কারণ আর এস এস-র লক্ষ্য 'হিন্দুরাষ্ট্র' গঠন, যে হিন্দুরাষ্ট্রে সামাজিক নীতি কোনো আইনসম্মত সংবিধানের ভিত্তিতে নয়। সামাজিক নীতি নির্ধারিত হবে ব্রাহ্মণ্যবাদের আকর গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'র ভিত্তিতে। দু'বছর ধরে গভীর আলোচনার মধ্য দিয়ে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি যে সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল তাতে দেশকে একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা। সেই উদ্দেশ্যকে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছে এমন একটি শক্তি যাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো ভূমিকা ছিল না। উপরন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে ব্রিটিশকে সাহায্য করার অভিযোগ আছে। একদিকে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে খর্ব, অপরদিকে নব্য উদার আর্থিক নীতিকে দ্রুতলয়ে কার্যকরী করতে চায় কেন্দ্রের শাসক দল। তারা দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি আর এস এস-এর নির্দেশিত পথে একদিকে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষেত্রকে গৈরিকীকরণের অপচেষ্টা শুরু করেছে, অপরদিকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর নামে মনমোহনী স্বপ্নের আড়ালে মানুষের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হয়েছে। অথচ লোকসভা নির্বাচনের আগে গরিব মানুষকে ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল 'বে-রোজগার কো রোজগার মিলেগা', 'সবকে লিয়ে আচ্ছে দিন' এর স্লোগানে মুখরিত হয়েছিল প্রাক্ নির্বাচনী প্রচার। কিন্তু কোনো সুরাহা জনগণের জন্য করা হয়েনি। করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনের কারণে যাঁরা জীবিকা হারালেন (মোট শ্রমজীবীর ৮০ শতাংশ) তাদের কোনো ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার ফলে একদিকে যেমন তাঁরা দারিদ্রের অন্ধকারে তলিয়ে গেলেন, তেমনই প্রয়োজনীয় খাবার কিনতে না পারার কারণে অপুষ্টির শিকার হলেন। সংক্রমণ বৃদ্ধি পেল। এই যখন পরিস্থিতি তখন দেশের সরকার সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকাকে রক্ষা না করে দেশের সম্পদকে জলের দরে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। কোটি কোটি শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে এই সরকার শুধু কর্পোরেট এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফা সুনিশ্চিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

নব্বই দশকের গোড়া থেকে দেশে অনুসৃত জনবিরোধী উদারবাদী অর্থনীতি আজ পরিণত হয়েছে চরম দক্ষিণপন্থী সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রনীতিতে। তথাকথিত জাতীয়তাবাদের নামে চরম উন্মত্ততা তৈরি করা হচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর উন্মত্ত শক্তি টার্গেট করেছে দেশের মেরুদণ্ড ছাত্র-যুব সমাজকে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চলছে চরম আক্রমণ। জে এন ইউ, জামিয়া-মালিয়া ছাত্রদের উপর সংগঠিত করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। বর্তমানে সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার আক্রান্ত। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেই ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ঘটে। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি আমাদের সাংবিধেনের ভিত্তি। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তিতে ভারতে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ, যাঁরা ভারতের নাগরিক সবার অধিকার সমান। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করা মানে দেশের সংবিধানকে অমর্যাদা বা অসম্মান করার সামিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাদের সংবিধানকে রক্ষা করার দায়িত্ব তারাই উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত ভাবে তাকে অবমাননা করছে।

দেশে উদারীকরণের ধাক্কায় ধনী-গরিবের অসাম্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জার্মানিতে হিটলার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং জাতিবিদ্বেষী প্রচার অভিযান তীব্রতর করে তুলেছিলেন। জার্মান জাতিকে ফ্যাসিস্টরা একটা উচ্চতর আর্যজাতি হিসাবে মনে করতো, অন্য সমস্ত মানুষকে নিকৃষ্ট নিচু স্তরের মানুষ ভাবতো। জার্মানরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তাই উচ্চতর জাতিরই অধিকার সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ববাদ কায়েম করার। তাদের হিংস্রতার চরম নিদর্শন ইহুদিদের নৃশংসভাবে গ্যাস চেম্বারে পুরে হত্যা করা। জার্মান, ইউরোপ থেকে ইহুদি হটিয়ে শুরু করেছিল কমিউনিস্ট নিধন। একই প্রক্রিয়ায় ফ্যাসিস্টধর্মী কার্যকলাপের ধারা আজ ভারতেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শাসকদলের ঘৃণ্য পদক্ষেপের প্রতিবাদ করলেই দেশদ্রোহিতার মামলা রুজু করা হচ্ছে, যাতে গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের বাক্‌রুদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার দায়িত্ব সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের। দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদেরও সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের কাজ গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি বামপন্থী

আন্দোলনের অগ্রবর্তী ঘাঁটি। তাই পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের কোনো ধরনের মুক্তিকামী আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারে না। তাই ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য ছিল বামপন্থীদের হঠানো। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে মানুষকে বিভ্রান্ত করে একটা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের উপর ভর করে (এখন সেই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে)। তারপর থেকে গত দশ বছর ধরে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে আক্রমণের মাত্রা আরও তীব্র করেছে। এই সরকারের সময়কালে মানুষের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। মিথ্যা মামলায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে জড়ানো হয়েছে। একটা লুম্পেন, তোলাবাজ বাহিনী তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসন থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে আধিপত্য কায়েম করেছে। পুলিশ প্রশাসন এই লুম্পেন বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। আক্রান্ত মানুষ পুলিশ প্রশাসনের কাছে কোনো সাহায্য না পেয়ে আতঙ্কগ্রস্ত, সন্ত্রস্ত। মহিলাদের নিরাপত্তা প্রশ্নের সম্মুখীন। একটা দমবন্ধ করা পরিবেশ। মানুষ এর থেকে নিস্তার চাইছেন। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা যোগ্যতার নিরিখে কাজ চাইলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের পরিবর্তে পরিবার ডেথ সার্টিফিকেট পাচ্ছে। চারিদিকে দুর্নীতি, অনাচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ সরব হয়েছেন। রাজ্যের মানুষের এই শাসক বিরোধী প্রতিবাদের ভাষাকে প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তি ব্যবহার করতে চাইছে। এই উভয়শক্তিই একে অপরের পরিপূরক। উভয় সরকারই তাদের স্বৈরাচারী অপকর্মের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে আটকে রাখতে পারছে না। তারা নানান ফন্দি-ফিকির করছে। কিন্তু রাজ্যের মানুষ ক্রমশ তার নিজ অভিজ্ঞতায় সচেতন হচ্ছেন। আন্দোলন-সংগ্রামের ময়দানে মানুষের যে ঐক্য গড়ে উঠেছে তাকে আরও নিবিড় ও সম্প্রসারিত করেই রক্ষা করতে হবে।

বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। আতঙ্কগ্রস্ত কর্মচারী সমাজ। প্রশাসনের একাংশ আমলার উদ্ধত আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বেছে বেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিসহ বামপন্থী সংগঠনের সদস্যদের উপর প্রশাসনিক সন্ত্রাস চলছে। যখন তখন নিয়ম বহির্ভূত ভাবে কর্মচারীদের বদলী করা হচ্ছে। আমলাদের কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয় শাসকদলের রাজনৈতিক কর্মী। বর্তমান শাসক দলের আমলে রাজ্য কর্মচারীরা আর্থিক ও অধিকারগত আক্রমণের সম্মুখীন। প্রশাসনের অভ্যন্তরে বিপুল পদ শূন্য। স্থায়ী পদে নতুন নিয়োগ নেই। চুক্তি প্রথায় নিয়োগের আড়ালে শাসক দলের দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হচ্ছে। অথচ বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৪টি বেতন কমিশন, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা, ডিএ মার্জার, মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকরি, শূন্যপদ পুরণ, ৬০ হাজার অস্থায়ী কর্মচারীকে স্থায়ীকরণ, গ্রেড প্রমোশন, ক্যারিয়ার আডভান্সমেন্ট, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি ইত্যাদি বহুবিধ দাবির সাথে ট্রেড ইউনিয়ন করার গণতান্ত্রিক অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার অর্জিত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রতি বছর কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মতো দু'কিস্তি করে মহার্ঘভাতা প্রদানের বিষয়টি অটুট ছিল। মহার্ঘভাতা দেওয়ার পাশাপাশি এই বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে—এই দাবি কর্মচারী সংগঠনগুলির সাথে বামফ্রন্ট সরকারও উত্থাপন করেছিল।

রাজ্যে বর্তমান সরকারের দশ বছরের শাসনের ইতিহাস রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সাথে বঞ্চনার ইতিহাস, ভাঁওতাবাজির ইতিহাস। একে আড়াল করার জন্য রাজ্যের শাসক দল এবং তাদের বংশবদ সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমগুলি রাজ্য সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা, বিপুল ঋণের বোঝা প্রভৃতিকে অজুহাত হিসেবে জাহির করছে। অথচ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা পূরণে তা কখনই অন্তরায় হয়নি। আসলে আর্থিক সঙ্গতি নয়, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে দুই সরকারের দুইরকম দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে।

কর্মচারীদের আর্থিক বঞ্চনার ক্ষোভকে ব্যবহার করে কোনো কোনো চক্রান্তকারী শক্তি কর্মচারী দরদী মুখোশ পরে ময়দানে নেমে পড়েছে। সপ্তম বেতন কমিশনের অলীক স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, যার কোনো বাস্তব ভিত্তিই নেই। কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই সরকার থাকলে আর্থিক পাওনা-গণ্ডায় কোনো বাধা থাকে না। কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই সরকার থাকলে উন্নয়নের কাজে সুবিধা হয়। এমনিতেই রাজ্যে গত ১০ বছরে এবং কেন্দ্রে গত ৭ বছরে উন্নয়ন ও অনুপ্রেরণা এবং বিকাশের ঠেলায় দেশবাসী, রাজ্যবাসীর নাভিশ্বাস উঠছে। এর পরেও কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকলে কতটা বেশি উন্নয়ন হয় তার প্রমাণ তো উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, আসাম, ত্রিপুরা, কর্ণাটক সহ একাধিক রাজ্যে আছেই। 'মানিকের ত্রিপুরা' থেকে 'হীরের ত্রিপুরায়' একই দলের সরকার যবে থেকে গড়ে উঠেছে তবে থেকে ত্রিপুরার প্রতি চৌমোহনীতে কী পরিমাণ হীরে প্রতিদিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার সাক্ষী সে রাজ্যের মানুষ। ১০৩২৩ শিক্ষকের স্থায়ী চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হীরক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমন প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। উল্টে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর জলকামান থেকে লাঠিচার্জ এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। রাজ্যের উন্নয়ন থেকে বিরোধীদের দমন পীড়নই এমন হীরক রাজ্যের মূল কাজ।

সারা দেশে 'বিকাশ' সম্পূর্ণ হওয়া এবং 'আচ্ছে দিন' এসে যাবার (!) পর আপাতত ডেস্টিনেশন বাংলা। সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি। সেই সোনার বাংলা যেখানে বিদ্যাসাগর সহজ পাঠ লেখেন, গরুর দুধে সোনা খুঁজে পাওয়া যায়, এতদিন যাদের দুর্নীতিগ্রস্ত তোলাবাজ বলে চিহ্নিত করা হতো, দলবদলের শ্বেতপুকুরে ডুব দিয়ে দেবদূতে পরিণত হওয়া সেই সব 'সফেদ' ব্যক্তিদের নবরূপে সোনার বাংলা গড়ার রূপকার হিসাবে দেখতে হবে!

প্রকৃত 'সোনার বাংলা' গঠন সম্ভব, যখন রাজ্যের মানুষ নিজ অধিকারে স্বাধীন ভাবনার ভিত্তিতে বেঁচে থাকতে পারবে। একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন শিল্প পরিষেবা ও কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে। আগামী প্রজন্ম স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার নিরিখে কোনো ধরনের অর্থের বিনিময় ছাড়াই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃত বাংলা তখনই গঠন সম্ভব, যখন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের জীবনধারনের মানোন্নয়ন ঘটানো যায়। এই বার্তাকে বাস্তবায়িত করতে উভয় শাসক দলের দ্বৈরথকে তুলে ধরা মিডিয়ার প্রচারের বিরুদ্ধে বিকল্প ভাষ্যকে তুলে ধরাই হলো প্রধান কাজ।

অভিজ্ঞতাই বড় শিক্ষক। স্মরণে রাখা প্রয়োজন রাজনৈতিক ভারসাম্য শ্রমজীবী মানুষের অনুকূলে আনতে বিকল্প ভাষ্য নির্মাণ প্রয়োজন। রাজনৈতিক ভারসাম্য শ্রমজীবী মানুষের অনুকূলে আনতে না পারলে অর্থনৈতিক দাবিও আদায় হয় না। বরং অর্জিত অধিকারগুলি খর্ব হয়। গত ১০ বছরের অভিজ্ঞতায় পুনরায় তা প্রমাণিত। কাজেই আর্থিক ও অধিকারগত বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে। পরিবার-পরিজনদের কাছে বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে হবে। কেননা আমাদের সুরক্ষার সাথে পরিবারের সুরক্ষার বিষয়টি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। তাদেরও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সামিল করতে হবে। পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাড়া এই অমানিশা থেকে মুক্তি নাই। □

অভিজ্ঞতার পরীক্ষাগারে নির্মীত চেতনাই হোক সিদ্ধান্ত গ্রহণের হাতিয়ার

বিজয় শঙ্কর সিংহ

দেশের সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্রে পাঁচ বছর অন্তর লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষ তাদের মৌলিক অধিকারের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বা করবেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বাধীন মত প্রকাশের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে। দেশের জনগণের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গণতান্ত্রিকভাবে সরকার পরিচালনাসহ বিরোধী দল ও তাদের মতামত পরামর্শকে মর্যাদা দেবে এটাই হলো আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র।

ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ঠিক হবে, আগামী পাঁচ বছর কারা বা কোন রাজনৈতিক শক্তি প্রশাসন পরিচালনা করবে। স্বভাবতই এই নির্বাচন অপরাপর রাজ্যবাসীর মতোই সরকারী কর্মচারীদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী কর্মচারীদের কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ কর্তা কারা হবে তাও ঠিক হবে।

এবারের নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, সামাজিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রসঙ্গে যা সাধারণভাবে জনমত গঠনের উপাদান হওয়া উচিৎ, সেগুলিকে শুরু থেকেই পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কহীন বিভিন্ন বিষয়, যেগুলির উৎস হলো অনৈতিকতা, সেগুলিকেই সামনে নিয়ে এসে সাধারণ মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। চূড়ান্ত অনৈতিকতা ও নীতিহীনতার মুখোশধারী দুটি রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে অশালীন তর্জা, তোলাবাজি ও কাটমানির বখরা নিয়ে ঘটে চলা মারামারি, কাটাকাটিকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হিসাবে সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করা হচ্ছে।

কর্পোরেট মিডিয়ার প্রাইম টাইমে শ্রমিক কৃষক কর্মচারীসহ খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন লড়াই সংগ্রামের কথা প্রচার করা হয়না। প্রচার করা হয়, সমাজবিরোধী বাহুবলীদের ঘনঘন জার্সি বদলের কথা। এক কথায় বলা যায়, অর্থনৈতিক সামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গ বর্জিত নীতিহীন দলাদলির ওপর ভিত্তি করে জনসমর্থনের মেরুকরণ ঘটানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে, গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই।

এখন দেশের সাত বছরের আর এস এস-বি জে পি সরকার ও রাজ্যে দশ বছরের তৃণমূল সরকারের কাজের ভয়ঙ্কর প্রভাব মানুষের জীবন অসহনীয় করে তুলেছে। সামনে উঠে এসেছে কর্মহীনতার চরম হতাশা আর তাকে অতিক্রম করার জন্য যুব সমাজ জীবন পর্যন্ত বাজি রেখেছে। এছাড়া কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পেট্রোপণ্যের দাম কমছে আর আমাদের দেশে লাগামছাড়া কর ও সেস বসিয়ে দামের সেঞ্চুরি হচ্ছে। দেশের রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থাগুলি বিক্রী করছে। এখন আবার ব্যাঙ্ক, বীমা বেসরকারিকরণ করছে দেশের সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার উপর চরম আঘাত আনছে। দেশে বেকারী ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোনো হেলদোল নেই আর এস এস-বি জে পি সরকারের। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। কৃষি আইন, শ্রম কোডের মাধ্যমে বিল এনে কৃষি ব্যবস্থাকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার ও ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। যদিও সারা দেশজুড়ে শ্রমিক কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে দিল্লীর বুকে রাজপথে ধরণা অবস্থানের কর্মসূচী জারি রেখেছে। কৃষি আইন বাতিল ও শ্রম কোড প্রত্যাহারের দাবিতে। এমনকি সারা দেশজুড়ে সাফল্যের সাথে একাধিকবার ধর্মঘট হয়েছে। ''সামনে দিন জোর লড়াই, জোট বাঁধ তৈরি হও'' এই মানসিকতা নিয়েই এই সংগ্রাম আন্দোলন চলবে। লকডাউনের নৃশংসতা, পরিযায়ী শ্রমিকদের দূরবস্থা সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। জনস্বাস্থ্যের কঙ্কালসার চেহারা, শিক্ষার বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদাকীকরণ নিয়ে এক ভয়ঙ্কর নৈরাজ্য চলছে। মহিলাদের অধিকার বিপন্ন ও নৃশংস অত্যাচার, আক্রমণ, সংখ্যালঘু, তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের উপর আক্রমণ, নির্যাতন ও শোষণ চলছে। মধ্যবিত্ত শ্রমিক কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা চরম আর্থিক ও অধিকারগত বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন।

আমাদের রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দশ বছরে সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে রাজ্যের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কুটির শিল্প, মাঝারি শিল্পে সব ক্ষেত্রে এক ধ্বংসাত্মক চেহারা নিয়েছে। সমাজে সব স্তরে লুম্পেনরাজ চলছে। মানুষের দুর্দশা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রশাসনের সব স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। বর্তমানে করোনা সংক্রমণের অতিমারি যে ভাবে বৃদ্ধি ঘটছে তাতে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারা প্রকাশ পেয়েছে। করোনা ও আমফানে ত্রাণ বণ্টন নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি নজিরবিহীন ঘটনা, এইরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ, শ্রমিক কর্মচারী ও শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে (আর্থিক ও অধিকারগত দাবিসহ) ধারাবাহিকভাবে লড়াই সংগ্রাম জারি রাখা হয়েছে। করোনা সংক্রমনকালে মানুষের স্বার্থে ও কর্মচারীদের জ্বলন্ত প্রশাসনিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে শারীরিক দূরত্ব বিধি মেনে কর্মসূচী করেছি। এছাড়া গত ৯ মার্চ, ২০২১ সব জেলা সদরে ও ১৬ মার্চ, ২০২১ কলকাতার ধর্মতলায় ৪ দফা দাবিতে (২-৫টা) ৩ ঘণ্টার অবস্থানের কর্মসূচী সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া করোনা অতিমারি সংক্রমণে ও (দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় করোনা প্রভাব দেখা দিচ্ছে) তাকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে আমরা বার্তা দিয়েছি। আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রশাসনিক ও সামাজিকভাবে এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এছাড়া বিগত দশ বছরে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার বিলুপ্তিকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া রয়েছে। মহার্ঘভাতার ঘোষণা করা হয় ভিক্ষার দানের মতো করে, যা কর্মচারী সমাজ ও তাদের পরিবারের প্রতি সামাজিক অসম্মান। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট আমাদের দেওয়া হয়নি। কমিশনের বক্তব্য আমরা জানতে পারলাম না, যা অতীতে হয়নি। অতীতে বামফ্রন্ট সরকার আমাদের কমিশনের রিপোর্ট দিত। আমরা তা দেখে আলোচনা করে সরকারের সাথে বসে আমাদের বক্তব্য বলার সুযোগ পেতাম। তারপর বিজ্ঞানসম্মতভাবে কমিশনের বর্ধিত বেতন চালু হতো। অথচ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কী ছিল, আর কী চালু করা হলো, কিছুই জানতে পারলাম না। বাড়ি ভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ করা হলো। মহার্ঘভাতা ও এরিয়ার ছাড়া বেতন কমিশন চালু করা হলো। ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ধর্মঘট করলে একদিনের বেতন কাটা ও একদিনের ডায়াস নন্ করা হয়। ন্যায্য অধিকারের জন্য আন্দোলন করলে FIR করা হয়। টিফিনের সময় ব্যক্তিগত সময় আন্দোলন করার ফলে সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সহসম্পাদকদ্বয়, কোষাধ্যক্ষ সহ ১৫ জন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের দার্জিলিং, কালিম্পং ও মুর্শিদাবাদে প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলী করা হয়েছে। এখনও তারা বদলী হয়েও অনেক সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম জারি রেখেছেন।

চুক্তি প্রথায় ও এজেন্সি প্রথায় কর্মচারীদের ব্যাপক শোষণ চলছে। আমরা চুক্তিপ্রথায় কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রসনের জন্য লড়াই করছি এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশনে নেওয়া মেমোরান্ডামেও আমরা বিস্তারিতভাবে বলেছি। অসহায় বেকার যুবক-যুবতীদের স্বার্থে প্রশাসনের অভ্যন্তরে লক্ষাধিক শূন্যপদ পূরণে আমরা সংগ্রাম করছি।

২০১১ সালের পূর্বে গত ৩৪ বছরে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পেয়েছি। কুখ্যাত সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল বাতিল, ৪টি বেতন কমিশনে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্নত মানের বর্ধিত বেতন চালু, বরখাস্ত কর্মচারীদের পুনর্বহাল, মৃত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকরি, মাস্টার রোল ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, ধর্মঘটসহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, সরকারী কর্মচারীদের বোনাস প্রদান, ৩৩ বছরের পরিবর্তে ২০ বছর চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হলে পূর্ণ পেনশন প্রদান, ঐতিহাসিক ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ্ স্কীম চালু করা, ৮-১৬-২৫-এর মাধ্যমে MCAS চালু, কর্মচারীদের বিভিন্ন ক্যাডারের উন্নতি, P.S.C ও S.S.C-র মাধ্যমে কর্মচারী ও শিক্ষকদের বছরে বছরে পরীক্ষা ও নিয়োগ, সর্বোপরি শ্রমিক কৃষকের স্বার্থে মজুরী বৃদ্ধি সহ বর্গা রেকর্ড (২৯ লক্ষ পরিবার উপকৃত), পাট্টা বিলি, গ্রামের সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, অবৈতনিক শিক্ষা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (৮০ ভাগ মহিলাদের নিয়ে গোষ্ঠী), ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার। এককথায় বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সব অংশের মানুষের অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল।

পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িকতার বিপদ দেখা দিচ্ছে, যা ২০১১ সালের পূর্বে কোনোদিন ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরে সাম্প্রদায়িক শক্তি আমাদের রাজ্যে এই বিষ দাঁত ফোটাতে পারেনি। রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে বিপদ আরো ঘনিভূত হচ্ছে। একমাত্র বামপন্থীরাই রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই বিপদের মোকাবিলা করতে মতাদর্শগতভাবে লড়াই সংগ্রাম জারি রেখেছে। মধ্যবিত্ত শ্রমিক কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষা কর্মীদের বাড়তি দায়িত্ব নিয়েই এই বিপদের মোকাবিলা করতে হবে।

এই রাজ্যে বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িকতা বিভাজনের শক্তি আর এস এস-বি জে পি সাধারণ মানুষ, কর্মচারী ও শিক্ষকদের গালভরা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও নেতৃত্ব আর এস এস-বি জে পি শাসিত আসাম, ত্রিপুরাসহ অন্যান্য রাজ্যের মতো প্রতিদিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

এখানে মনে রাখতে হবে গত ৩ মার্চ, ২০১৮ ত্রিপুরায় আর এস এস-বি জে পি ক্ষমতায় এসেছে। সাধারণ মানুষ ও কর্মচারী স্বার্থে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সরকারে এসে বিরোধীদের সংগঠন করার ও মত প্রকাশ করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের হত্যা লীলা চলছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ করা হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন অফিস দখল, নেতাদের দৈহিক আক্রমণসহ ব্যাপক সন্ত্রাস চলছে। বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, মহিলাদের উপর নৃশংস আক্রমণ, লুঠপাট সহ মিথ্যা মামলায় ফাসানো চলছে। অত্যাচার, অনাচার, জরিমানা, অপমান ও আত্মসমর্পণ কিছুই বাদ যাচ্ছে না। অরাজকতা চলছে। পশ্চিমবাংলার গত দশ বছরের শাসনের কার্বন কপি। তার উপর বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও বিভাজনের রাজনীতি চলছে। ত্রিপুরায় নির্বাচনের আগে সোনার বাংলার মতো (‘‘ vision Document for Tripura, 2018) ত্রিপুরার জন্য মানুষের স্বপ্ন দলিল প্রকাশ করা হয়েছিল। মানুষকে চূড়ান্ত ভাঁওতা দেওয়ার জন্য তা আজ প্রমাণিত এবং মানুষ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। প্রতি পরিবারে miss call করলেই চাকুরি দেবে। সপ্তম বেতন কমিশনে আরো বর্ধিত সুবিধা প্রদান, (যা দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বেআইনীভাবে আমাদের রাজ্যেও সপ্তম বেতন কমিশন বসানোর কথা বলেছেন) চুক্তি প্রথায় কর্মচারীদের নিয়মিতকরণসহ একাধিক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যা আজ ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রমিক কৃষক কর্মচারী, যুবক-যুবতী সহ সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন। প্যানেলভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের তালিকা বাতিল করা হয়েছে। সরকারী কাজে আউটসোর্সিং চালু, চুক্তিপ্রথার কর্মচারীদের বাড়ি পাঠিয়ে, এজেন্সি প্রথায় নিয়োগ করে চরম শোষণ চলছে। নিউ পেনশন স্কীম চালু (NPS), বিগত ৩ বছরে ১ শতাংশ মহার্ঘভাতা দেয়নি। সপ্তম বেতন কমিশনে বর্ধিত বেতন কিছুই হয়নি। মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকুরি বন্ধ, ৫০ বছর বয়স অথবা ৩০ বছর চাকুরি হয়েছে এমন কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ চালু, স্থায়ী পদে এজেন্সি প্রথায় নিয়োগ, সরকারী বিদ্যালয় বেসরকারীকরণ, ১০৩২৩ জন সরকারী শিক্ষক নিয়োগ বাতিল সহ একাধিক চরম বঞ্চনা চলছে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের বুঝতে হবে রাজ্যের দশ বছরের সরকার ও ত্রিপুরা, আসম সহ বিভিন্ন রাজ্যের চরম উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা পরিচালিত সরকারগুলি হচ্ছে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

গত দশ বছরে চরম আর্থিক ও অধিকারগত (ষষ্ঠ বেতন কমিশনে একাধিক বঞ্চনা, বকেয়া ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা) বঞ্চনার জবাব দিতে আমাদের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হিসাব বুঝে নিতে হবে।

তাই আমাদের রাজ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচন অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগ্রাম সমুপস্থিত। অতীতের মতো এই রাজনৈতিক সংগ্রামেই দ্বিবিধ দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। আমাদের অতীত ঐতিহ্যকে বহন করেই সাহসিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাজ্যের বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও বর্তমানে বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কলুষিত রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য রাজ্যের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগ জারি রেখেছে। তার সাথে সাযুজ্য রেখে দেশের ও রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরীখে রাজ্য পরিস্থিতির জনস্বার্থমুখী পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন

থেকে রাজ্যের সর্বস্তরের কর্মচারীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে, কোনো ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ

শ্রীকান্ত মুখার্জি

করুন। কারণ পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা। তাই আসুন, পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর সংগ্রামে আমরা ইতিহাস নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে ব্রতী হই। অবস্থান বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন তৃণমূলের দশ বছরের সীমাহীন দুর্নীতির জন্য মানুষের অসন্তোষ ক্ষোভের আঁচ পেয়েই মানুষের সহানুভূতি কুড়নোর সেই চিরাচরিত কৌশল নিয়ে অবলম্বন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মানুষ স্থির করে নিয়েছে এই দুর্নীতিবাজ তৃণমূল

এবং রাতারাতি তৃণমূল থেকে বিজেপি হয়ে রং বদলানোদের শাসন ক্ষমতা থেকে হটিয়েই রাজ্যের বেহাল অবস্থার বদল আনবেন। মাঠে-ময়দানে, কলকারখানায়, অফিস-আদালতে, পাড়ায় পাড়ায় সেই আভাসই মিলছে। সংযুক্ত মোর্চাকে নিয়ে মানুষের যে উৎসাহ তৈরি হয়েছে গোটা রাজ্যজুড়ে তাতে অশনি সঙ্কেত দেখছে তৃণমূল। তাই বামপন্থীদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরপরই বিভিন্নভাবে সহানুভূতি কুড়ানোর কৌশল। সুজন চক্রবর্তী এদিন জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেছেন সংযুক্ত মোর্চার সরকার এক বছরের মধ্যে সরকারী শূন্যপদে নিয়োগের ব্যবস্থা করে বেকারির যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা করবে। ছোটো, বড় মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। সরকারী

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

নকল নয় আসল যুদ্ধে সঙ্গী হব আমরা

বামেরা শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হাত ধরলো। এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের উদ্দেশ্য অনেক গুঢ়। প্রশ্নটা তোলা হচ্ছে আইএসএফ নেতা আব্বাস সিদ্দিকিকে নিয়ে। আব্বাস সিদ্দিকি একজন পীড়, ফেজ টুপি পড়েন এটা সত্যি। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের মৌলবি পীড়দের রাজনৈতিক মঞ্চে বক্তব্য রাখতে অতীতেও দেখা গেছে। কিন্তু তারা সবাই তাদের ধর্মীয় সত্তাকে ব্যবহার করে বক্তব্য রেখেছেন। মুসলিম ভোট কোনো না কোনো শক্তিকে পাইয়ে দেওয়ার দর কষাকষি করেছেন। সেখানে আই এস এফ-র পক্ষ থেকে বক্তার সেদিনের বক্তব্যে ইসলাম ধর্ম বা মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো বক্তব্য শোনা যায়নি। বরঞ্চ শোনা গেছে দলমত-জাত-ধর্ম নির্বিশেষে নিপীড়িতদের হক আদায়ের কথা, তাদের হয়ে লড়াই করার কথা। এটা শাসকশ্রেণীর যে না পসন্দ। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিজাব পরে প্রার্থনায় ভঙ্গীরত অবস্থায় ছবি দিলে তা সাম্প্রদায়িক নয়, বিজেপি তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা ইফতারের পার্টিতে গেলে সেটা অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু একজন ফেজ টুপিধারী মুসলমান সবাইকে নিয়ে মাতৃভূমি রক্ষার আহ্বান দিলে তিনি সাম্প্রদায়িক। আসলে সংখ্যালঘুদের ভোট বাক্স হিসেবে ব্যবহার করার দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির চিরকালীন প্রথার গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছে সেদিনের গোটা ব্রিগেড। এটা শাসকশ্রেণীর সহ্য হচ্ছে না। তাই শুরু হয়েছে নন্ ইস্যুকে ইস্যু করার কৌশল।

সব ষড়যন্ত্রের অমানিশ্যা কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ২ মে '২১ নতুন সূর্য উদয়ের প্রত্যাশায় রাজ্যবাসী। যে সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠবে নিপীড়িত মানুষের টিমটিমে ঘরগুলি। কৃষক শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক, বেকার যুবক, মহিলা সকলের মুখে হাসি ফোটাক ২ মে। আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা পরিবার-পরিজনসহ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবো এই সুন্দর সকালের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে। এমন সকাল আসুক যেখানে মুখ লুকোবার জায়গা পাবে না সাম্প্রদায়িক শক্তি সহ ইতিহাসকে পিছনে টানার শক্তিগুলি। আমাদের অভিজ্ঞতাই আমাদের পথনির্দেশক। রাজ্য সরকারী কর্মচারী হিসাবে আমাদের স্বর্ণযুগ ছিল ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের আমল। বিগত দশ বছরে তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। আর আমাদের বিভ্রান্ত করতে বিজেপি বলছে, সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা হবে। ঠিক এমনটাই তো বলেছিলেন মমতা ব্যানার্জী ক্ষমতায় আসার আগে। ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে বিজেপির সরকার ক্ষমতায় আসার আগে নির্বাচনী প্রচারে 'ভিশন ডকুমেন্ট' এর নামে কর্মচারীদের নানা প্রতিশ্রুতি বি জে পি দিয়েছিল। তার মধ্যে ৭ম বেতন কমিশন কার্যকরী করার কথা ছিল। আজ পর্যন্ত তা হয়নি। উল্টে ১ জুলাই ২০১৮ থেকে সেখানে কন্ট্রিবিউটরি পেনশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা কেড়ে নেওয়ার আদেশনামা বেড়িয়েছে। অতি সম্প্রতি ১০৩২৩ জন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক দের চাকুরির দাবিতে আন্দোলনের উপর নৃশংস আক্রমণ নামিয়ে এনেছে ত্রিপুরার বিজেপি সরকার। ডাল-ভাত খেতে খেতে ডিম-ভাত, মাছ ভাত বা মাংস ভাত খাবার ইচ্ছে হওয়াটা স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু ডাল-ভাত খেতে খেতে একটু ভালো খাবার লোভে না বুঝে বিষ মানুষ একবারই খায়। সেটা আমরা ২০১১ সালে খেয়ে ফেলেছি। এখন চাই বিষের জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে। নির্মল বাতাসে শ্বাস নিতে। এই লক্ষ্যেই অভিজ্ঞতার নিরিখে এই নির্বাচনে সপরিবারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবো আমরা, রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। □

ক্ষেত্রে কর্মরতদের জন্য বিগত দিনে যে সুব্যবস্থা কায়েম করেছিল বামফ্রন্ট সরকার সেই পরিমণ্ডল ফিরিয়ে আনা হবে। সুজন চক্রবর্তী এদিন তৃণমূলের 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' স্লোগানের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, দশ বছর ধরে রাজ্যের মানুষের উন্নয়ন না করে, বেকারের ভবিষ্যৎকে চুরমার করে, কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে মেলা খেলার তামাশা করে কাটানো এই মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষের হৃদয়ে জায়গা পাবেন না। বিজ্ঞাপন আর নাটকের মধ্য দিয়ে এ রাজ্যের সচেতন মানুষকে আর বিভ্রান্ত করা যাবে না।

বিশিষ্ট আইনজীবি ও রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, তৃণমূল-বি জে পি-র জনবিরোধী মানুষ

সভার শুরুতে স্লোগান শাউটিং

মারা নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবাদ প্রতিরোধ, বিক্ষোভ সংগঠিত হয়ে চলছে। দিল্লীতে কৃষকরা লড়ছেন। কলকারখানায় শ্রমিক কর্মচারীরা লড়ছেন। কাজ ও শিক্ষার দাবিতে

সন্দীপ রায়

ছাত্র-যুবদের উত্তাল বিক্ষোভ জানান দিচ্ছে তৃণমূল-বি জে পি প্রতিদিন জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে।

ভবতোষ রায়

সভার সমস্ত বক্তাদেরই মূল বক্তব্য ছিল বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের একেবারে গোড়া থেকে শুরু হওয়া নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্বে, নাগরিক জীবনে রাষ্ট্রের জনহিতকর ভূমিকাকে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত করার ফলে শ্রমিক-কৃষক সহ সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে এসেছে। এর ফলেই কৃষক যেমন তাঁর ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না, তেমনই সংগঠিত ক্ষেত্র ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ার ফলেই শ্রমিক কর্মচারীদের দর কষাকষির ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। নয়া কৃষি আইন এবং শ্রম আইন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই আক্রমণ তীব্রতর হয়েছে।

এই তিন দশকে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শাসকের পরিবর্তন ঘটলেও এবং কখনও কখনও সংসদের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের জোরালো উপস্থিতি এবং দেশব্যাপী শ্রমিক-কর্মচারীদের ধারাবাহিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও ধর্মঘটের চাপে সংস্কার প্রক্রিয়ার গতি শ্লথ করা বা 'এম এন রেগা প্রকল্প'-র মতো কিছু জনমুখী কর্মসূচী রূপায়ণ করা সম্ভব হলেও একচেটিয়া পুঁজি ও লগ্নীপুঁজির স্বার্থবাহী নীতির অভিমুখ সাধারণভাবে অপরিবর্তিত থেকেছে।

নয়া উদারবাদী সংস্কার প্রক্রিয়ার মাত্রাতিরিক্ত তীব্রতা এবং বে-আব্রু রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছি ২০১৪ সাল থেকে, যখন নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আর এস এস পরিচালিত বি জে পি একক গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। মোদি জমানার আর একটি কদর্যরূপ হলো, আর এস এস-র আদর্শ অনুযায়ী কট্টর হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডার রূপায়ন। ফলত, কর্পোরেট তোষণ ও সংখ্যালঘু বিদ্বেষের যৌথ কার্যক্রম সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে একই সাথে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। একদিকে দারিদ্র, বেকারি ও অসাম্যের বৃদ্ধি, অপরদিকে এন পি আর, সি এ এ, এন আর সি-র মাধ্যমে সংবিধানের নির্দেশকে অমান্য করে ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে সংখ্যালঘু অংশকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার উদ্যোগ সমান্তরালে চলেছে।

এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতেই এসেছে করোনা সংক্রমণ, অপরিকল্পিত লকডাউন। করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে মোদি সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতার ফলে, সর্বাধিক আক্রান্ত ও মৃতের তালিকায় আমাদের দেশ লজ্জাজনকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। অথচ মোদি সরকার নির্লজ্জভাবে এই সময়কালকেই ব্যবহার করছে তার কর্পোরেট তোষণ ও হিন্দুত্ববাদী কার্যক্রমের দ্রুত

দীপক মিত্র

রূপায়ণের জন্য। তিনটি কৃষি আইন প্রণয়ন, শ্রম আইনের পরিবর্তে শ্রমকোড তৈরি, ব্যাঙ্ক-বীমা-প্রতিরক্ষা সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের ঢালাও বেসরকারীকরণ যেমন কর্পোরেট পুঁজি ও আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজিকে তোষণের উদাহরণ, তেমনই সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা বাতিল করা, কাশ্মীর রাজ্যকে ভেঙে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা, রামমন্দিরের শিল্যান্যাস,

আশীষ ভট্টাচার্য, সভাপতি

লাভ-জিহাদ প্রভৃতি হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচীর দৃষ্টান্ত। তবে উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ হলো, এই দ্বি-ফলা আক্রমণের বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমান্বয়ে প্রবল ঢেউয়ের আকার গ্রহণ করছে। যার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হলো চলমান ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন।

নয়া উদারবাদী পর্বের প্রথম দু'দশক জুড়ে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থানের কারণে, এই রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষ অনেকাংশেই একটা সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে আমরা থাকতে পেরেছিলাম। কেন্দ্রীয় নীতির অভিঘাতকে যথাসম্ভব প্রতিরোধ করে, বিকল্প নীতির পথে মানুষের জীবন ও জীবিকার রক্ষা করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হতো। কিন্তু এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে ২০১১-র পরবর্তী

গৌতম মজুমদার

সময়ে। কেন্দ্রীয় নীতির বিকল্প পথে হাঁটা তো দূরের কথা, একই নীতিকে একই ধরনের একাগ্রতা নিয়ে কার্যকরী চলেছে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল।

কেন্দ্রীয় নীতির মৌখিক বিরোধিতার লম্বা চওড়া ভাষণের আড়ালে শ্রমিক-কৃষক সহ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও জীবিকাকে একইভাবে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি কেন্দ্রে হিন্দুত্ববাদী এ্যাজেন্ডাকে প্রতিহত করার নামে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে জনসমাজের অভ্যন্তরে ধর্মীয় বিভাজনকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এই সময়কালে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। বিপুল শূন্যপদ পূরণ না করার, সামান্য মজুরির বিনিময়ে চুক্তিপ্রথায় নিয়োগ, প্রশাসন পরিচালনায় আমলাতন্ত্রের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা জ্ঞাপন, কর্মচারীদের অর্জিত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর আক্রমণ গত দশ বছরে এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

যদিও এর বিরুদ্ধে কর্মচারীদের সংঘটিত করে ধারাবাহিক লড়াইয়ের রাস্তায় রয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এই সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতা হল রাজ্যে পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন ছাড়া শ্রমিক কর্মচারীদের জীবন জীবিকা সুরক্ষা সম্ভব নয়। তাই রাজ্য পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামে সকলকে অংশগ্রহণ করতেই হবে। দাবি প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ, পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষে সন্দীপ রায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কস ইউনিয়নের পক্ষে দীপক মিত্র, কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষে শ্রীকান্ত মুখার্জী, কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষে গৌতম মজুমদার এবং স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে ভবতোষ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। □

ভারসাম্যের পরিবর্তন করতে হবে—মীনাক্ষী মুখার্জী

আমি শুরুতেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংগ্রামী মেজাজ, শাসকের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহসকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। আমাদের ছোটোবেলায় যখন স্কুলে পড়তাম, তখন দিদিমনিরা স্পোর্টস-এর সময় চক দিয়ে লাইন টেনে দিতেন। বলতেন, অন্যকে ডিস্টার্ব না করে, অন্যের স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিয়ে তোমাকে নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে দৌড়তে হবে। ভালোভাবে দৌড়নোর জন্য প্রয়োজন ছিল শারীরিক পুষ্টি এবং মানসিক আগ্রহ ও ভালোভাবে দৌড়নোর মানসিকতা। এই মানসিকতা গঠনের উপাদান সংগৃহীত হয় পরিবারের মধ্যে থেকে, আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে এবং সমাজ থেকে। স্কুল জীবনের এই শিক্ষা পরবর্তী জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেখানে প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে, অন্যকে ডিস্টার্ব না করে, নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। নিজের মানসিকতার ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে হবে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তনের জন্য। আমাকে একজন অভিভাবক, যিনি পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, বলেছিলেন, 'ক্ষুদ্‌কো বদলো, ক্ষুদ্‌কো বদল্‌নেকে লিয়ে আপনি সোচ্‌কো বদলো, সোচ্‌কো বদল্‌নেকে লিয়ে আপনি নজারিয়াকো বদলো।' অর্থাৎ নিজেকে বদলাতে গেলে, নিজের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে হবে। রাজস্থানের মরুভূমিতে যাঁরা গেছেন, তাঁরা দেখেছেন, বিরাট পাথরের চাঁই, যার নিচের অংশটা সরু। নিচের অংশটা অপেক্ষাকৃত নরম শিলা দিয়ে তৈরি হওয়ায় বেশি ক্ষয় হয়, ওপরের অংশের তুলনায়। ঠিক তেমনই সমাজের যারা দরিদ্র, অবহেলিত নিচের অংশের মানুষ, তাদের ক্ষতি হয় বেশি। এদের মধ্যে আবার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হন মহিলারা। অবহেলিত অংশের মধ্যেও, মহিলারা তুলনামূলক ভাবে যে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হন, তার শরীরবৃত্তীয়, মানসিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে। শরীরবৃত্তীয় কারণের পরিবর্তন করা যাবে না। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে হবে। ভাবনাকে পাল্টাতে হবে। এর জন্য নিজের সঙ্গে নিজেকে লড়াই করতে হবে। আর সমাজটাকে পাল্টাতে হবে। এই কাজে নারী সমাজের দুর্বলতর অংশকে পথ দেখাতে পারেন আপনারা, যাঁরা সংগঠিত ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত, যাঁদের পায়ের তলার জমিটা শক্ত। বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আপনারা যদি রাস্তায় নেমে এঁদের পথ দেখান, তাহলে ওঁরা ভরসা পাবে।

যারা সমাজটাকে বদলাতে চান, রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন চান, তাঁদের দুর্বলতর অংশের ভরসার স্থান হয়ে উঠতে হবে। এর জন্য নিজেদের আরও বেশি তৈরি করতে হবে, যাতে অন্যদের আমরা তৈরি করতে পারি। আপনাদের কাছ থেকে সাহস পেয়েছি। সেই সাহস নিয়েই আমরা নবান্ন অভিযানে গেছিলাম। আমাদের কারও পিঠ ব্যারিকেডের দিকে ছিল না। আমরা সবাই ব্যারিকেডের মুখোমুখি হয়েছিলাম। মইদুলকে ওরা হত্যা করেছে। ১৬-১৭ বছরের ছাত্রীকে পুরুষ পুলিশ পিটিয়েছে। কিন্তু কেউ রাস্তা ছেড়ে যায়নি। এই অদম্য মানসিকতাই আগামী দিনে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন আনবে।

আমেরিকার নারী দর্জি শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা কমানোর লড়াই, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের বীজ বপন করেছিল। ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে নারীরা সংগঠিত হয়েছিলেন। ১১৭টি দেশের শতাধিক মহিলা প্রতিনিধি এগিয়ে এসেছিলেন এই দাবির সমর্থনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রাশিয়ার মেয়েরা সেই দেশের শান্তি ও রুটির দাবিতে আন্দোলনে অংশ নেয়। রুশ দেশে বিপ্লবের পর নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। প্রকৃত নারী মুক্তির পথ হল, উৎপাদনের কাজে নারীদের শ্রমকে যুক্ত করা। অথচ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারীদের কাছে এই সুযোগ বহুলাংশে সীমাবদ্ধ। প্রতিদিন নারীরা গড়ে ৩০০ মিনিট বিনা পারিশ্রমিকে গার্হস্থ্য শ্রম দেন। পুঁজিবাদ নারীদের শ্রমের মূল্য দেয় না, কিন্তু অভাবী নারীদের দেহকে পণ্য করে। করোনার সময় সারা বিশ্বে যত মানুষ কাজ হারিয়েছেন, তার ৫০ শতাংশই মহিলা। মেয়েদের ওপর গার্হস্থ্য হিংসা বেড়েছে। বেড়েছে আত্মহত্যার সংখ্যা। ২০১৯-এর ৮ মার্চ তারিখের পরিসংখ্যান হল, প্রতি ৯ মিনিটে একজন নারী আত্মহত্যা করেছেন। তাই লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান চাই। কিন্তু এটি কোনো নারীবাদী স্লোগান নয়।

নারীদের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে একটা মানসিকতা কাজ করে। কার পয়সায় খাব? অসুস্থ হলে কে দেখবে? এই থেকে আত্মসমর্পণের মানসিকতা তৈরি হয়। একে আরও বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের নামে দয়ার সংস্কৃতি, দানের সংস্কৃতি চলছে। এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে অধিকার বোধ গড়ে তুলতে হবে। আর তার জন্য এটাই হচ্ছে সঠিক সময়। সঠিক সময় নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ভগৎ সিং লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে বোমা ফেলার আগে বলেছিলেন। এই সময়েই ঘুরে দাঁড়াতে হবে। কারণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যোগসাজশে মানুষের উপর আক্রমণ নামছে। একদিকে নারী কল্যানের বাজেট হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে ধনীদের উপর প্রত্যক্ষ কর কমছে, স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার কমছে। উত্তরপ্রদেশে নারী শ্রমিকদের নাসবন্দী করা হচ্ছে, যাতে প্রসূতীকালীন ছুটি বা অন্য সুযোগ সুবিধা দিতে না হয়, অন্যদিকে যারাই প্রতিবাদ করছেন, পুরুষ বা নারী, তাঁদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। দুর্নীতির সামাজিকীকরণ ঘটানো হচ্ছে। ফলে এটাই সঠিক সময় রুখে দাঁড়াবার। গ্রামে শস্য নষ্ট করা গরুদের গলায় যেমন কাঠ ঝুলিয়ে দেয়, তেমনই সমাজকে যারা প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে কলুষিত করছে। তাদেরকে পরাস্ত করে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। □

দশ বছর ধরে শুধু বঞ্চনা আর কথার খেলাপ

উৎসর্গ মিত্র

(পরবর্তী অংশ)

❑ গত দশ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বেনজির। শাসক দলের দলত্যাগী বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু স্বীকারও করেছেন সে কথা। তাঁর কথায় শুধু তাঁর পরিবার নয়, দলীয় কর্মীদেরই নাম তোলা হয়েছিল টেটের নিয়োগ তালিকায় এবং সেটা করা হয়েছিল দলের শীর্ষ মহলের নির্দেশেই।

❑ টেটে এক বিশ্বজিৎ কুণ্ডুরই পরিবার থেকে চাকরি পেয়েছে পাঁচ জন—স্ত্রী, মামা, বৌদি, শ্যালিকা এবং পিসতুতো ভাই। চাকরি পেয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপির তৃণমূল বিধায়ক যোগরঞ্জন হলাদারের ছেলে, ভাইজি, জামাই। বীরভূম জালা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সহ তিনজনও এই চাকরি লুঠের তালিকায় সামিল। এছাড়াও আছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুরের তৃণমূল বিধায়ক অমিয় ভট্টাচার্যের মেয়ে, তমলুকের বিধায়ক মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের ভাইঝি, হলদিয়ার বিধায়ক শিউলি সাহার ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, ভাগ্নে, ভাগ্নে, লাল্গড় ব্লক তৃণমূল সভাপতি বনবিহারী রায়ের ভাইপো, শালার ছেলে, উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার থেকে নির্বাচিত পরিষদীয় সচিব অমল আচার্যের মেয়ে, ভাইপো, আপ্ত সহায়কের বোন সহ তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের পরিবার এবং আত্মীয়রা। এক কথায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের মেধাতালিকার মূল্যায়ন ২০১১ সালের পর থেকে তৃণমূল ভবন থেকেই হয়।

❑ গত দশ বছরে মেধাবী সফল বেকারেরা শিক্ষক পদে চাকরি পাননি। টেট, এসএসসি'র নিয়োগ হয়েছে সম্পূর্ণ অস্বচ্ছভাবে। নেতা-মন্ত্রীদের দাবি মতো তালিকা তৈরি করতে বাধ্য হয়েছে আধিকারিকেরা। প্রতি বছর টেট পরীক্ষা গ্রহণ তো দূরস্থান, সেই ২০১৪ সালে যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁদের একটা বড়ো অংশেরই নিয়োগ এখনও বাকি পড়ে আছে!

❑ টেট পাশ করার পর সাত বছর হল চাকরি পাননি, এমন প্রশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা লক্ষাধিক। তাঁরা আদালতেরও দ্বারস্থ হয়েছেন। এমতাবস্থায় হঠাৎই সরকার ঘোষণা করে যে, ২০২০ সালের ২১ জানুয়ারি ফের টেট পরীক্ষা হবে। প্রশিক্ষিত বেকারেরা ফের টেট পরীক্ষায় বসতে চাইলে সরকার অগ্রাহ্য করে। আদালত নির্দেশ দেয় পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার। সরকার বাধ্য হয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু পরদিনই আদালতে আপিল করে জানায় যে তারা আদালতের নির্দেশ পালন করলেও ঐসব পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র পরীক্ষা করবে না। বর্তমান সরকারের নির্লজ্জতা আর নির্মমতার এ এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

❑ ২০১১ সালে সরকার তৈরি হওয়ার মাত্র আড়াই বছরের মাথায় জাতীয় মহিলা কমিশন জানিয়ে দেয় যে এ রাজ্যের কোথাও দিনের কোনোসময়েই মহিলারা নিরাপদ নন। দশ বছর পরেও সেই ছবির বদল নেই। জাতীয় মহিলা কমিশনের পর্যবেক্ষণ থেকে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর তত্ত্য—কোনো কিছুকেই আমল দিতে চাইছে না বেপরোয়া সরকার। উপরন্তু ২০১৩ সালের পর থেকে ক্রাইম ব্যুরোর কাছে পরিসংখ্যানই পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে সরকার—উদ্দেশ্য যাতে কোনোরকমেই অপরাধের তথ্য প্রকাশ হয়ে না পড়ে। অপরাধীকে দমন নয়, অপরাধকে ধামাচাপা দেওয়াই এই সরকারের একমাত্র যোগ্যতা। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর অজুহাত, "জনসংখ্যা বাড়ছে বলে ধর্ষণ ও মহিলা নির্যাতন বাড়ছে"!

❑ 'স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প'এ কতটা সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা, তাই নিয়ে সন্দিহান খোদ চিকিৎসকেরাই। একদিকে ভোটের আগে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ইস্যু করে দিয়ে দায় সারছে সরকার, অন্যদিকে খরচের হিসেবে নিয়ে প্রমাদ গুণছে কর্পোরেট হাসপাতাল— দু'পক্ষই ঘোর অন্ধকারে। সোস্যাল মিডিয়া জুড়ে "আমি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পেয়ে গেলাম" ধরনের বক্তব্য ও অনেকের ছবি দিয়ে প্রচার চলছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসার কী হবে, তা নিয়ে সংশয় ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। বেসরকারী হাসপাতালগুলি সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে চিকিৎসার রেট বা বরাদ্দের পরিমাণ না বাড়ালে তারা স্বাস্থ্যসাথীর অধীনে পরিষেবা দিতে পারবে না। ফলে স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে তৃণমূলের প্রচার আর বাস্তবের ফারাক ক্রমশ প্রকট হচ্ছে।

❑ রাজ্যের সব মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। দাবির সঙ্গে বাস্তবের ফারাক টের পাইয়ে দিয়েছে দুয়ারে সরকার কর্মসূচী। দিন বাড়িয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে কর্মসূচী। দু'মাসের ওপর শিবিরেই জমা পড়েছে ২৩ লক্ষের বেশি আবেদন, কার্ড হিসেবে চাহিদার সংখ্যা আরও বেশি। আবেদন আর নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সরকারী তথ্যেই বিভ্রান্তি এবং গরমিল বিস্তর। সরকারী শিবির ফেরত হাজার হাজার মানুষ রোজ এসে হানা দিচ্ছেন খাদ্য দপ্তরের স্থানীয় অফিসে। সেখানকার কর্মীরাও বলতে পারছেন না কবে মিলবে রেশন কার্ড। এমনকি প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যান অন্ন যোজনায় রাজ্যের জন্যে বরাদ্দ প্রায় পাঁচ হাজার টন চালও উপভোক্তার অভাবে পড়ে রয়েছে সরকারের কাছে।

❑ মানুষের হাতে প্রাপ্য রেশন কার্ড তুলে দিতে ব্যর্থ সরকার এখন রান্না করা খাবারের প্রকল্প চালু করার নামে মানুষের জন্যে বরাদ্দ চালেও ভাগ বসাতে চলেছে। 'মা' নামে যে প্রকল্প ঢাক ঢোল পিটিয়ে শুরু করা হয়েছে, তা আসলে আর কে এস ওয়াই-২ রেশন কার্ডের গ্রাহকদের জন্য বরাদ্দ করা চাল দিয়ে তৈরি করা ভাত। এছাড়াও বিভিন্ন আইসিডিএস সেন্টার, মিড ডে মিল থেকেও শিশুদের বঞ্চিত করা হচ্ছে ভোটের আগে প্রচারের উদ্দেশ্যে চালু করা এই 'মা' প্রকল্পে খাবার যোগানের জন্যে!

❑ গত বছরের ৪ নভেম্বরে নবান্ন সভাগৃহ থেকে মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় সরকারের জমিতে কলোনি গড়ে বসবাসকারী বেশ কয়েকজনের হাতে জমির পাট্টা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, "একটাও উদবাস্তু কলোনিকে বে-আইন বলা যাবে না। সবটাই একসাথে আইনি করে দিলাম। উদবাস্তুদের পাট্টা দেওয়া মানে তারা এখন দেশের নাগরিক"। ঘটনা হলো, যাঁদের পাট্টা দেওয়া হয়েছে নাম কেনার জন্যে, তাদের একটা বড়ো অংশই রেলের জমির জবরদখলকারী। অর্থাৎ এদেরকে পাট্টা বিলি করার অধিকারই নেই রাজ্য সরকারের। যথারীতি রেল আপত্তি জানিয়েছে গোটা প্রক্রিয়ায় এবং পাট্টা প্রাপকেরা পড়েছেন অকূলপাথারে— সস্তায় নাম কেনায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রবল আগ্রহের ফল ভুগতে হচ্ছে তাঁদের।

❑ রেশনের চাল। আমফান দুর্গতদের জন্য পাঠানো ত্রাণ ইত্যাদি চুরির অভিযোগ আগে থেকেই ছিল, এবারে এ রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কোভিড থেকে সুরক্ষার টিকা চুরিরও নিদর্শন মিললো যত্রতত্র। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের ঘোষণায় স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে টিকাকরণের প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতালের কর্মী, ডাক্তারি পড়ুয়া, অঙ্গনওয়াড়ি, আশা কর্মী প্রমুখ ফ্রন্টলাইন কর্মীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেওয়া হবে কোভিশিল্ডের প্রথম ডোজ, কিন্তু টিকাকরণের প্রথম দিন থেকেই দেখা গেল সব কিছু উপেক্ষা করে স্রেফ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফ্রন্টলাইনের যোদ্ধাদের টপকে তৃণমূল নেতা, বিধায়ক, কাউন্সিলর, জেলা পরিষদ থেকে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ—এমনকি কোথাও কোথাও তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও নির্লজ্জের মতো ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়ে ফেলেছেন। ফলে সে সময়ে টান পড়ে গেছিল টিকার বাঁড়ারে। এতে অবশ্য লজ্জা ছিল না এই সমস্ত নীতিহীন নেতাদের মধ্যে। তাঁরা সে সময়ে ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের কাজের সাফাই দিতে। তাঁদের সর্বময় নেত্রীরও এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য ছিল না!

❑ পাঁচ বছর আগে ঢাক ঢোল পিটিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্রীড়ানীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। 'বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়ন'ই নাকি এর লক্ষ্য, অথচ দেখা যাচ্ছে 'উৎসাহ' দেওয়ার নামে যত্রতত্র ক্লাবগুলিকে বছরে দু'লক্ষ টাকা বিলি করা চাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে বহু ক্লাবই আছে, যাদের অস্তিত্ব শুধুই খাতায় কলমে—খেলাধুলার ময়দানে এদের খুঁজে পাওয়া না গেলেও সমস্ত ভোটের ময়দানে এদের সদস্যদের দেখতে পাওয়া যায় শাসক দলের হয়ে পেশি ফোলাতে। বোঝাই যাচ্ছে টাকা বিলির আসল উদ্দেশ্যটা কী! এদিকে আবার মুখ্যমন্ত্রীর দুই ভাই দখল করে বসে আছেন রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার নানা উচ্চপদ। ফলে সে সব সংস্থায় ডামাডোল চলছে বিস্তর এবং বেজায় সমস্যায় পড়ে যাচ্ছেন ক্রীড়াবিদরা। তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন ভিন রাজ্যে পাড়ি জমাতে। সরকারের অপদার্থতায় অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই ক্রীড়াক্ষেত্রের অবস্থাও যথেষ্ট করুণ!

❑ তৃণমূল তৈরির পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত ১৩ বছরের মমতা ব্যানার্জি ৭২টি বনধ ডেকেছেন। বামফ্রন্ট বিরোধিতা করেছে, কিন্তু বনধ সমর্থকদের জোর করে চাকরি, কাজ কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখিয়ে অফিসে, কারখানায় আসতে বাধ্য করেনি। এই মমতা ব্যানার্জিই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 'ডাইস নন' জারি করেছেন বামপন্থীদের ডাকা প্রতিটি ধর্মঘটে। ধর্মঘটের দিন অফিসে না এলে মাইনে কাটা, চাকরিতে ছেদের বে-আইনি হুমকি অবধি দেওয়া হয়েছে। কারখানার শ্রমিকদের কাজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অটো, টোটো না চালালে রুট থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যেও একই হাল। অথচ ধর্মঘট শ্রমিক-কর্মচারীদের আইনি অধিকার, কিন্তু বনধ সম্পূর্ণ বে-আইনি এক প্রক্রিয়া। নিজের অতীত ভুলে গিয়ে মমতা ব্যানার্জি এখন তৎপর শ্রমিকের অধিকারে লাথি মারায়।

❑ এ রাজ্যে এখন বিধায়ক, সাংসদ থেকে জনপ্রতিনিধি, মামুলি অভিনেতা—সকলেই যেন খোলা বাজারের পণ্য। দল ভাঙানোর খেলায় বিজেপি এবং তৃণমূল একে অন্যের দোসর এবং এটাকে তারা 'সাফল্য' বলেই মনে করে। এ অনৈতিকতার অবসান দরকার।

❑ বামফ্রন্টের সময়ে পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা—প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচন হতো নির্দিষ্ট সময় অন্তর। তৃণমূলের আমলে দু'বার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে—দু'বারই নির্বাচন নিয়ে টালাবাহানা হয়েছে। পৌরসভার নির্বাচনের অবস্থা আরও করুণ—কোথাওই সময়মতো নির্বাচন হয়নি, প্রতিবারই সমস্ত জায়গাতে প্রশাসক বসিয়ে বকলমে রাজ্য সরকারের শাসন চালানো হয়েছে, ঠিক এখন যেমন চলছে রাজ্যের বেশির ভাগ পৌরসভায়। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
48th Year, 10th Special E-Edition, March 2021
Regd. No. : 18484/71

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি / ২০ /২১ তারিখ ঃ ১৫-০৩-২০২১

মাননীয়
মুখ্যসচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ ০১/০১/২০১৬ পরবর্তী পেনশনারদের পেনশন, ফ্যামিলি পেনশন, গ্র্যাচুইটি এবং কমিউটেশনের সংশোধিত সুযোগ-সুবিধার দ্রুত নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আপনি নিশ্চিতভাবে অবহিত আছেন যে গত ১ অক্টোবর, ২০১৯ রোপা, ২০১৯-এর আদেশনামা প্রকাশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ০১/০১/২০১৬ পূর্ববর্তী পেনশনার / ফ্যামিলি পেনশনারদের অবসরকালীন সুবিধার পাশাপাশি ০১/০১/২০১৬ পরবর্তী পেনশনার / ফ্যামিলি পেনশনারদের পেনশন / ফ্যামিলি পেনশন, গ্র্যাচুইটি ও কমিউটেশনের সংশোধিত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আদেশনামা প্রকাশিত হয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো প্রায় আঠারো মাস অতিক্রম করা সত্ত্বেও ঐ আদেশনামা অনুযায়ী ০১/০১/২০১৬ পরবর্তী বিশাল অংশের পেনশনার / ফ্যামিলি পেনশনারদের সংশোধিত প্রাপ্য পেনশন / ফ্যামিলি পেনশন, গ্র্যাচুইটি এবং কমিউটেশনের এখনও কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। এর ফলে এই দুর্মূল্যের বাজারে প্রবীণ প্রাক্তন কর্মচারী / আধিকারিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ছেন। সরকারী ন্যায্য প্রাপ্যের দ্রুত নিষ্পত্তি না হওয়ায় তাঁদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে।

এমতাবস্থায় সমগ্র পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বিষয়গুলির দ্রুত সুমীমাংসার জন্য দায়িত্ববদ্ধ কর্তৃপক্ষগণ যাতে বিশেষ এবং সময় ভিত্তিক উদ্যোগ নেন সে ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা আপনার সবিশেষ হস্তক্ষেপ দাবি করছি।

একই সঙ্গে অবসরগ্রহণের দিনেই অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামার সঠিক ও যথাযথ রূপায়নের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে যে শৈথিল্য ঘটছে তা দূর করার জন্য প্রশাসনিক হস্তক্ষেপেরও আবেদন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি / ১৬ /২১ তারিখ ঃ ১২-০৩-২০২১

সমীপে,
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক,
পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় ঃ নির্বাচন কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত

মহাশয়,

আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেই (পত্র নং ঃ কো-অর্ডি/৬৬/২০ তাং ঃ ১৫/০২/২০২১) বিভিন্ন জেলায় নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে, রাজ্য প্রশাসনে চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের একাংশকে আইন বহির্ভূত পদ্ধতিতে ব্যবহারের বিষয়টি সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলাম।

আমরা আনন্দিত, এই আইন বহির্ভূত প্রক্রিয়া বন্ধ করার সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা নং ১৪৫৮(২৪)-স্বরাষ্ট্র (নির্বাচন) তাং ঃ ১ মার্চ, ২০২১, আপনার পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা উল্লেখ করতে চাই, এখনও কোনো কোনো কেন্দ্রে এই নির্দেশিকাকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না।

এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি উল্লেখ্য, তা হলো 'পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত'। নির্বাচনের কাজে যুক্ত প্রত্যেক কর্মী যাতে নিরাপদে এবং অভ্রান্ত প্রক্রিয়ায় পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, করোনা অতিমারির প্রকোপ অনেকাংশে দুর্বল হলেও, সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি। এমতাবস্থায় নির্বাচনের কাজে যুক্ত সর্বস্তরের কর্মীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার প্রসঙ্গটি অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।

চতুর্থত, নির্বাচনী কাজে যুক্ত সমস্ত স্তরের মহিলা কর্মচারীদের সুস্থভাবে নির্বাচনী কাজ সম্পাদনের উপযুক্ত পরিকাঠামো ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। একই সাথে দ্রুত সাক্ষাতে আলোচনার জন্য একটি দিন ধার্য করার অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

জেলায়, জেলায় অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচী

গত ৯ মার্চ, ২০২১ চার দফা দাবিকে রাজ্যের প্রতিটি জেলা সদরে (একমাত্র হাওড়া জেলায় কর্মসূচীটি অনুষ্ঠিত হয় ১০ মার্চ) তিন ঘণ্টা ব্যাপী অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। সারা রাজ্যে নির্বাচনী দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, তিন সংখ্যাধিক কর্মচারী অর্ধদিবস / পূর্ণ দিবস ছুটি নিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচীগুলিতে অংশগ্রহণ করেন।

চার দফা দাবি—(১) কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, (২) শূন্যপদ পূরণ সহ চুক্তিপ্রথায় কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদান, (৩) প্রতিহিংসা পরায়ণ বদলি এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ করা, (৪) গণতন্ত্র, ধর্মঘটের অধিকারসহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ করা চলবে না এবং সাম্প্রদায়িক মেরুকরণসহ বহুমাত্রিক মেরুকরণের ঘৃণ্য রাজনীতি বন্ধ করো।

জেলা	সভাপতিমণ্ডলী	প্রস্তাবক	বক্তা
হাওড়া	শেফালী নস্কর, অমল বিশ্বাস	সঞ্জয় দাস (যুগ্ম সম্পাদক)	অসিত দাস (জেলা সম্পাদক) নিবেদিতা দাশগুপ্ত, সমীর ব্যানার্জী (জেলা নেতৃত্ব)। অসিত ভট্টাচার্য (কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য)
দার্জিলিং	কল্পনা ভৌমিক	অরিন্দম মিত্র (যুগ্ম সম্পাদক)	মৃত্যুঞ্জয় সরকার (সভাপতি), অজয় চক্রবর্তী (১২ই জুলাই কমিটি) দীপেন কুণ্ডু (পেনশনার্স সমিতি) লিটন পান্ডে (কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ) দেবব্রত রায় (কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক)
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	দেবাশিষ মোহতি মনোজ ব্যানার্জী	সুব্রত দেব (জেলা যুগ্ম সম্পাদক)	দেবাশীষ নন্দী (জেলা সহ-সম্পাদক), রজত সাহা (জেলা সম্পাদক), সুফল চক্রবর্তী (১২ই জুলাই কমিটি), সুমিত ভট্টাচার্য (সম্পাদক, সংগ্রামী হাতিয়ার)
বাঁকুড়া	সুনীল মাহাতো, সোমনাথ হাতাই	মনোজ ব্যানার্জী (যুগ্ম সম্পাদক)	অতনু মজুমদার (জেলা সম্পাদক), সুতপা হাজরা (কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য)
মালদা	সুপ্তি পাল	হিমাংশু দে (যুগ্ম সম্পাদক)	সুবীর রায় (জেলা সম্পাদক), শঙ্কর সরকার (জয়েন্ট কাউন্সিল), গোপাল মুখার্জি (বিদ্যুৎ পর্ষদ ওঃ বেঃ ইঃ), রতন ভাস্কর (১২ই জুলাই কমিটি)
বীরভূম	অঞ্জনা বীরজলা	সোমেন চ্যাটার্জী (যুগ্ম সম্পাদক)	উজ্জ্বল মুখার্জি (জেলা সম্পাদক), জওহর লাল জানা (১২ই জুলাই কমিটি) মানস কুমার বড়ুয়া (সহযোগী সম্পাদক, সংগ্রামী হাতিয়ার)
দক্ষিণ দিনাজপুর	সমাপ্তি পণ্ডিত, সুশান্ত দত্ত	কৃষ্ণা ঘোষ	বিভাস দাস (জেলা সম্পাদক, জয়ন্দ চন্দ (১২ই জুলাই কমিটি), স্বপন সরকার (পেনশনার্স সমিতি)
পুরুলিয়া	লালমোহন গ্রহাচার্য	রামাশীষ অধিকারী (জেলা সম্পাদক)	রাধেশ্যাম দত্ত (যুগ্ম সম্পাদক), প্রচেতা কুমার দাস (১২ই জুলাই কমিটি), সুমন কান্তি নাগ (কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য)
পূর্ব মেদিনীপুর			প্রণব কর (কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য)
পশ্চিম বর্ধমান	শর্মিষ্ঠা নন্দী, অজয় রায় (সভাপতি)	কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য (যুগ সম্পাদক)	সুজিত মুখোপাধ্যায়, জয়চাঁদ ঘোষ, বিজয় শঙ্কর সিংহ
ঝাড়গ্রাম	ফাল্গুনী চক্রবর্তী, মানস সাঁতরা	গৌতম ব্যানার্জি (জেলা যুগ্ম সম্পাদক)	সত্যবান সাউ (জেলা সম্পাদক), বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী (যুগ্ম সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি)

পশ্চিম বর্ধমান

ঝাড়গ্রাম

পূর্ব মেদিনীপুর

মালদা

হাওড়া

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

পুরুলিয়া

নারী দিবসের জেলা কর্মসূচীর রিপোর্ট পরের সংখ্যায়

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।